ড. ইয়াদ কুনাইবি

ইসলাম প্রতিষ্ঠা

সমকালীন ভাবনায় সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

তারা কি জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করে? দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম শাসক আর কে হতে পারে? *-সূরা মায়েদা : ১৫০*

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ওপর অবিচল থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি এভাবে কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে। *-সহীহ মুসলিম : ১৯২০*

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা

সময়টা তখন ২০১১ এর সূচনাকাল। পুরো আরব-বিশ্বজুড়ে বসন্তের হাওয়া বইছে। আরব বসন্তের এই হাওয়া তিউনিসিয়া থেকে মিসরে এসে দোলা দিয়েছে। জনগণ জাগছে, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবি উঠছে। একে একে জালিম ও স্বৈরাচারীদের পতন ঘটতে শুরু করেছে। আর এই সময়টাতে সবচেয়ে বড় সুযোগ তৈরি হলো ইসলামপন্থীদের। অধিকাংশ জনমত তাদের পক্ষে। সকল ইসলামপন্থী দলের এক উদ্দেশ্য, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কিন্তু পদ্ধতি কী?

এই একটি প্রশ্নে এসে এক গন্তব্যের সকলে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে শুরু করলেন। যে করেই হোক শরীয়াহ যে প্রতিষ্ঠা করতেই হয়। কিছু ইসলামপন্থী দল শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শরীয়াহকেই বলি দিয়ে দিলেন! জনগণের একক সার্বভৌমত্বকে হেকমত ও তাওরিয়ার নাম দিয়ে জায়েয করলেন! শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার এই কর্মীরা গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হলেন! এর জন্যে জীবনও দিতে প্রস্তুত বলে হুমকি ছাড়লেন। শুধু কি তা-ই! হাকিমিয়্যাহর মতো গুরুত্বপূর্ণ আকীদায় জনমনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন। বিভ্রান্তি আরও গভীর হলো তখন, যখন কিছু আলেম এই পদ্ধতিকে সমর্থন দিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তারা শুধু এতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। ক্ষমতায় পৌঁছতে এত বড় বড় ছাড় দিলেন, যা সেক্যুলার পার্টিগুলোও দিতে লজ্জায় পড়ে যাবে। আবার ক্ষমতায় আরোহণের পর পশ্চিমকে সন্তুষ্ট করতে ও নিজেদের খাঁটি গণতন্ত্রপন্থী প্রমাণ করতে গিয়ে তারা যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির নামে ইসলামকে এমনভাবে বিকৃত করলেন, যা মুহাম্মাদের ﷺ আনিত সে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের এতসব বিকৃতি ও বিভ্রান্তিকে খুলে খুলে বর্ণনা করতে 'নুসরতান লিশ শরীয়াহ' নামে একটি সিরিজ তৈরি করতে শুরু করেন জর্ডানের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইয়াদ কুনাইবী হাফি.।

ড. ইয়াদ কুনাইবী সে সমস্ত বিশ্লেষকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আরব বসন্তের সময়ে ইসলামপন্থীদের আচরণ খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার এই সিরিজ তিনি শুরু করেন ২০১২ সালে। যে সময় মিসরের শাসনক্ষমতায় ছিল ইসলামপন্থী দল ইখওয়ানুল মুসলিমীন। তিনি তাদেরকে মূল উদ্দেশ্যে রেখে সংশোধনীমূলক একের পর এক বার্তা দিতে থাকেন এই সিরিজের মাধ্যমে। কিন্তু গণতন্ত্রের স্রোতে

ভেসে যাওয়া উম্মাহ, দূরদর্শী চোখের এই সতর্কবার্তায় কর্ণপাত করেনি। তাই সে সময় সিরিজটি খুব একটা পরিচিতি পায়নি।

কিন্তু ১৩-তে যখন মুরসির পতন ঘটল, তারপর একে একে ইসলামপন্থীদের ভুলগুলো স্পষ্ট হতে লাগল তখন এই সিরিজটি প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। কয়েক বছর আগের ভিডিওগুলো যেন তখন জীবন্ত হতে থাকল, দিনে দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা বাড়তে লাগল। এই ঘটনা নিশ্চয় সিরিজটির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তা বুঝতে সহায়তা করবে।

মোডারেট ইসলামের দৌরাত্ম্যে প্রতারিত আজকের যুবকশ্রেণিকে বইটি ইনশাআল্লাহ সঠিক পথ দেখাবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুনতে থাকা প্রতিটি অন্তরকে প্রচলিত ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো: ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক বা না-হোক, আমরা যেন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারি, যে অবস্থায় আমাদের অন্তরে শরীয়াহর প্রতি বিন্দু পরিমাণের বিকৃত মনোভাব থাকবে না।

বইটি সাধারণের পাঠযোগ্য হওয়ার জন্যে অনুবাদে যতটা সহজতা ও সরলতার আশ্রয় নেওয়া যায় তা নেওয়া হয়েছে। জানা কথা, অনুবাদের পরিপূর্ণ হক পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কিছু অংশ অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এর পরিমাণ খুবই স্বল্প। পুরো সিরিজটির প্রয়োজনীয় সব স্থানে টীকা যোগ করা হয়েছে। আর কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ অনুবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য অনুবাদগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

সর্বাত্মক চেষ্টার পরও ভুল থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। মূল বই থেকে শুরু করে টীকা-টিপ্পনী পর্যন্ত যদি কোথাও ভুল চোখে পড়ে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল।

একটি বই, যার সাথে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের পরিশ্রম ও চিন্তা। আল্লাহ সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমাদের তাঁর শরীয়াহর অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

আরশাদ আনসারী
জামেয়া দারুল মা'আরিফ
imarshadanasary@gmail.com

ভূমিকা

নুসরতান লিশ শরীয়াহ। সিরিজটি মূলত আমার সে সমস্ত ভাইদের উদ্দেশ্যে রচিত, যারা নিজেদের 'ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক' পরিচয় দেন, স্বৈরশাসনের পতনের কারণে যারা সরকার গঠনের সুযোগ পেয়েছেন, যারা জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্যে এই সিরিজটি বার্তা হিসেবে থাকবে। তাদের বলবে, ওহে ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকেরা, ক্ষমতায় আরোহণের পর বিপর্যয় ও পতনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

এই সিরিজটি মুসলিম উম্মাহকেও উদ্দেশ্য করে বার্তা দেবে। তাদের বলবে, হে মহান মুসলিম মিল্লাত, খুব দৃঢ়তার সাথে 'ইসলামিক' বলা হয় এমন অনেক ময়দানেও ইসলামের দেখা মেলে না। অতএব শরীয়াহ কায়েম করতে গিয়ে কোনো নামধারী ইসলামী দল যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এটা বলে বসবেন না যে, ইসলামী শাসন ইতিপূর্বে আমরা পরখ করে দেখেছি, এটি আমাদের কোনো উপকারেই আসল না! শরীয়াহর কোনো প্রয়োজন আর আমরা দেখছি না।

কেননা, অনেক এমন ইসলামী দল রয়েছে, যারা ইসলামের সঠিক রূপকে উপস্থাপন করে না। এ-কারণে তাদের ব্যর্থতার দায় ইসলামের ওপর বর্তানো যাবে না।

এই সিরিজটি তৈরিতে আমি বলতে গেলে অনেকটা বাধ্য হয়েছিলাম, যখন কিছু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বলতে শুনেছিলাম, যদি তারা শাসনক্ষমতা হাতে পান তাহলে এক দফায় শতভাগ শরীয়াহ আইন কার্যকর করবেন না; বরং ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তারা শরীয়াহ বাস্তবায়নের দিকে হাঁটবেন। পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়নের এই ধারণা একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুসলিমেরও থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না। ইসলাম প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রিক এমন আরও অসংখ্য ভুল জনমনে গেড়ে বসেছে, যার উপনোদন করা জরুরি মনে করছি।

অতএব এই সিরিজটিতে এ-সংক্রান্ত উপদেশমূলক কিছু বার্তা থাকবে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই আলোচনায় আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং হাত ধরে হকের পথে নিয়ে আসেন।

যেহেতু এই বিষয়টি অনেক বেশি ডালপালাবিশিষ্ট তাই প্রতিটি পয়েন্টকে আলাদা আলাদা পর্বে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালাব। আলোচনা সামান্য দীর্ঘ হলেও তা উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। পাঠকের মানসপটে প্রতিটি পর্ব শেষে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় ঘটবে তার উত্তর ইনশাআল্লাহ অন্যান্য পর্বে পেয়ে যাবেন।

শরীয়াহ্ বাস্তবায়নের পূর্বে অন্যান্য সমস্যার সমাধান জরুরি!

পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নে যারা বিশ্বাসী তাদের যুক্তি হলো, প্রথমে দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরি। অর্থাৎ, আগে তো মানুষদের খাওয়াও, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করো। তারপর নাহয় শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে।

এই ধরনের বক্তব্য অনেকটা ইসলামের প্রতি আক্রমণাত্মক ও বৈপরীত্যপূর্ণ। প্রথমত, আমরা মুসলিম হিসেবে এই বিশ্বাস রাখি যে, দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও বিশৃঙ্খলা মূলত শরীয়াহ আইনের অনুপস্থিতিরই ফল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

'জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানোর উদ্দেশ্যে, যাতে করে তারা ফিরে আসে।'[১]

বিশৃঙ্খলা শব্দের ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ এভাবে করেন; স্বল্প বরকত, অসচ্ছল জীবনযাপন, পণ্যের ঊর্ধ্ব-মূল্য ও মন্দাভাব।[২]

তো বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির উপায় কী?

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

'যাতে করে তারা ফিরে আসে।'[৩]

তারা যেন আল্লাহর পরিপূর্ণ শরীয়াহর দিকে ফিরে আসে। পদ্ধতিগতভাবে, বিশ্বাসগতভাবে আর বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে।

---

১. সূরা রোম: ৪১।

২. দেখুন তাফসীরে রূহুল মায়ানী: ৪৮/১১।

৩. সূরা আলে ইমরান: ৭২।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

'আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। সেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে প্রচুর রিযক আসত। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন।'[৪]

বান্দা আল্লাহর নেয়ামতে ডুবে থাকবে আর তাঁর আদেশ মেনে চলবে না, তাঁর বাতলে দেওয়া আইনকে প্রতিষ্ঠা করবে না এরচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে? অতএব আল্লাহর অবতীর্ণ শরীয়াহকে হটিয়ে দেওয়া, তার নেয়ামতকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আর এটিই বর্তমান সময়ে ক্ষুধা, অনিরাপত্তা ও অন্যান্য সব অশান্তির মূল কারণ।

হাদীসে এসেছে:

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

'কোনো জাতি যখনই প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় মত্ত হয় তখনই তাদের মাঝে এমন মহামারি ও রোগ ছড়িয়ে পড়ে, যার কোনো নজির পূর্ববর্তীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। যখনই কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কম দেয়, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ও জালিম

---

৪. সূরা নাহল: ১১২।

শাসকের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। যখনই কোনো সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাদের বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়। যদি-না জীবজন্তু থাকত তাহলে তাদের ওপর কখনোই বর্ষিত হতো না। যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে তখন আল্লাহ তাদের ওপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেন। এরপর এরা তাদের সম্পদকে গ্রাস করে নেয়। কোনো শাসক যদি আল্লাহর কিতাব দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা না করে ও তাঁর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ না করে, আল্লাহ তাদের পরস্পরের মাঝে বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেন।'[৫]

এই হাদীসে বর্ণিত অবস্থার দিকে গভীর দৃষ্টি দিন। দেখবেন সেখানে উল্লেখিত সবগুলো শাস্তিই শরীয়াহ কার্যকর না করার পরিণতিতে এসেছিল। অশ্লীলতার প্রসার মূলত তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ না করার ফল। যাকাত না দেওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্র ইসলামী না হলেই একমাত্র সম্ভব। কেননা, অনৈসলামী রাষ্ট্র কারও ওপর যাকাতকে আবশ্যক করতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হবে তখন যখন শরীয়াহ আইন কার্যকর করা ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপর তো রাসূল ﷺ স্পষ্ট করেই বলেছেন: কোনো শাসক যখন আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে না...।

তো শরীয়াহ কার্যকর না করার যতগুলো অবস্থা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর পরিণতি কী ছিল? রোগব্যাধি, শাসকের অত্যাচার অর্থাৎ স্বৈরশাসন, বৃষ্টি থেমে যাওয়া, ঔপনিবেশ ও সম্পদের ক্ষয়, মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদ অর্থাৎ ভয়, যুদ্ধ, ডাকাতি ও অনিরাপত্তা।

আমরা আজ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার সবই শরীয়াহ কায়েম না করার ফল। অথচ এরা বলে: দরিদ্রতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার পূর্বে আপাতত শরীয়াহকে সরিয়ে রাখা উচিত। যেন তারা ওষুধ বাদ দিয়ে রোগের মাধ্যমেই রোগের চিকিৎসা করতে চায়!

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের শেষাংশ এমন,

سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

---

৫. ইবনে মাজাহ: ৪০১৯; হাকেম: ৮৬২৩।

'আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা অপসারিত হবে না একমাত্র তোমাদের দীনের দিকে ফিরে আসা ছাড়া।'[৬]

নিজের দীন ও শরীয়াহর দিকে ফিরে আসাই হলো বাঁচার একমাত্র উপায়। আর নাহয় আমরা একটি শূন্য বৃত্তে আবর্তিত হতেই থাকব। আশ্চর্য! আমরা আমাদের এই সমস্যাগুলো এমনভাবে সমাধান করতে চাই, যা আমাদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেবে! অনেকটা গরম থেকে রক্ষা পেতে আগুনের শরণাপন্ন হওয়ার মতোই।

তাহলে সমাধান কী? সমাধান হলো আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

'আর যদি জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান আনত আর আল্লাহকে ভয় পেত, তবে আমি তাদের ওপর আসমান ও জমিনের নেয়ামতরাজি উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের পাকড়াও করলাম।'[৭]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾

'আর যদি আহলে-কিতাবরা ঈমান এনে খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদের নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম। আর যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল ও প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করত তবে তারা তাদের ওপর ও পায়ের নীচ থেকে

---

৬. আবু দাউদ: ৩৪৬২।

৭. সূরা আ'রাফ: ৯৬।

খাবার ভক্ষণ করত। বস্তুত তাদের কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী আর অধিকাংশ কতই-না মন্দকাজ করে যাচ্ছে।'[৮]

অতএব আমরা যদি সত্যিকারার্থেই দরিদ্রতা, বেকারত্ব, বিশৃঙ্খলা ও অনিরাপত্তা থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়াহ বাস্তবায়ন ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। বাকি-সব মরীচিকা ও প্রলোভনের পেছনে দৌড়ানোর নামান্তর।

এই পর্বের সারকথা হলো, সমাজের বর্তমান সমস্যাগুলোর সমাধান একমাত্র শরীয়াহ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

শরীয়াহকে অবমূল্যায়ন করবেন না

"প্রথমত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হওয়া উচিত তারপর নাহয় শরীয়াহ প্রয়োগ করা হবে।" সত্যিকারার্থে এ ধরনের বক্তব্য আল্লাহর দীনকে অবমূল্যায়ন করার নামান্তর। এর মাধ্যমে যেন এই দীনের গুরুত্বকে কম করে দেখা হয়। যদি শরীয়াহ-বিরোধী মানবরচিত আইন ও সংবিধান সত্যই মানুষের এতটা উপযোগী হতো, যদি এর মাধ্যমে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তাহলে শরীয়াহর আর প্রয়োজনই-বা কী ছিল?

এই বক্তব্যের মাধ্যমে কী এটাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে আমরা দুনিয়ায় উন্নতি করব আর শরীয়াহ প্রয়োগের মাধ্যমে আখেরাতে কল্যাণ সাধন করব? শরীয়াহ কি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই কল্যাণ সাধনের জন্যে আসেনি? যিনি শরীয়াহ অবতীর্ণ করেছেন তিনি কি তাঁর বান্দাগণ দুনিয়ায় কিসের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী সে সম্পর্কে জানতেন না?

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি তো সূক্ষ্মজ্ঞানী ও সম্যকজ্ঞাত।'[৯]

---

৮. সূরা মায়েদা: ৬৫-৬৬।

৯. সূরা মুলক: ১৪।

আল্লাহ কি মানুষের ওপর দয়ার্দ্র হয়ে, তাদের দুর্বলতার কথা চিন্তা করে শরীয়াহকে অবতীর্ণ করেননি? তিনি কি জানতেন না যে তার পথপ্রদর্শন ছাড়া মানুষ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে অক্ষম?

মহান আল্লাহ শরীয়তের একটি বিধান বর্ণনা করার পর বলেছেন:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

'আল্লাহ তোমাদের জন্যে সবকিছুকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ তোমাদের দেখিয়ে দিতে চান এবং ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। আর আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। অন্যদিকে যারা কামনা-বাসনার পূজারি তারা চায়, তোমরা যেন পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান। বস্তুত মানুষকে দুর্বলভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১০]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের সেই প্রবৃত্তিপূজারিদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও সংবিধান থেকে মুক্তি দেবেন, যারা মানুষদের আখেরাতের জাহান্নামে পতিত হওয়ার আগে দুনিয়ার জাহান্নামে একবার পতিত করে। যারা হিদায়াত, বরকত, সরলতা ও কল্যাণের পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত করে রাখে। তারপর আল্লাহ বলেছেন:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

'আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান। বস্তুত মানুষকে দুর্বলভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১১]

---

১০. সূরা নিসা: ২৬-২৮।

১১. প্রাগুক্ত।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন কারণ, তিনি জানেন যে মানুষ দুর্বল। অতএব আল্লাহ চান মানবরচিত সংবিধানের কষ্ট ও জটিলতা থেকে মানুষদের রক্ষা করতে। যেমনটা কুরআনে এসেছে,

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

'জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং হৃদয়ে তা সাজিয়ে দিয়েছেন। আর অন্যদিকে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদের অন্তরে ঘৃণা জন্মে দিয়েছেন। আর তারাই তো সুপথপ্রাপ্ত।'[১২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সম্বোধন সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে, যারা ছিলেন আত্মার পরিশুদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও মনোপ্রবৃত্তি দমনে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের বলছেন যে, যদি তাদের নবী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আবদার মেনে নেন তবে তারাই কষ্ট পাবে। তাহলে সে সমস্ত লোকের বানানো সংবিধানের ক্ষেত্রে আপনার কী ধারণা, যাদের অন্তরে নেই কোনো তাকওয়া, নেই স্বচ্ছতা? যারা সকাল-সন্ধ্যা নিজস্ব প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থে বিভোর হয়ে থাকে? তাদের বানানো নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে আমরা সমাজের এই ভঙ্গুর অবস্থার উন্নতি সাধন করব?!

এরপর আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

﴿وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন।'[১৩]

ঈমান কী? ঈমান হলো আল্লাহর দীন, তাঁর শরীয়াহ।

---

১২. সূরা হুজরাত: ৭।
১৩. প্রাগুক্ত।

এই পর্বের সারকথা হলো, "প্রথমত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হওয়া উচিত তারপরই নাহয় শরীয়াহ প্রয়োগ করা হবে।" এমন বক্তব্য শরীয়াহকে অবমূল্যায়ন করার নামান্তর। বরঞ্চ শরীয়াহই সমাজের সমস্যা দূর করবে। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ সাধন করবে।

পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগের বিপজ্জনক অর্থ

"আমরা কিছুকাল শরীয়াহ বাদ দিয়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতে চাই।" এই বাক্য কি কোনো মুসলিমের হতে পারে? আচ্ছা এবার আরেকটি বাক্য দেখুন। "আমরা পর্যায়ক্রমে ধীরেসুস্থে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চাই।" সত্যিকারার্থে প্রথমোক্ত বাক্যের সাথে দ্বিতীয় বাক্যের খুব একটা পার্থক্য নেই। কেননা, শরীয়াহ আইন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার সোজা অর্থ হলো, আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছুকাল শরীয়াহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করব।

আচ্ছা, কেন বললাম, উভয় বাক্য প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ?

কারণ, যে ব্যক্তি ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে সে নিশ্চয় রাষ্ট্রকে নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে খালি পাবে না। আচ্ছা যদি ধরেও নিই, এমনই একটি খালি রাষ্ট্র পেয়ে সে সেখানে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করতে লাগল। প্রথমে শতকরা দশভাগ, পরে বিশভাগ এভাবে শতভাগ শরীয়াহ বাস্তবায়ন করল, মাঝখানের সময়টাতে মানবরচিত কোনো আইন প্রয়োগ করা ছাড়া। তখন বলা সম্ভব হবে যে, সে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করেছে আর মাঝখানে অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেনি।

কিন্তু বাস্তবে কেউ যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছান, তখন তার সামনে মানবরচিত একটি পরিপূর্ণ সংবিধান থাকে। যার মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ফৌজদারী সমস্ত আইন বিদ্যমান থাকে। এই আইনগুলো হয় আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়াহ আইনের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব কেউ যখন পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের কথা বলেন, উদাহরণস্বরূপ তিনি যদি প্রথমে ৫০% এমন আইন দিয়ে শাসন করেন, যা শরীয়তের বিধানসম্মত, বাকি ৫০% শাসন তো তার মানবরচিত আইনের মাধ্যমেই করতে হবে। নাকি?

এমন হলে তারা আল্লাহর এই আয়াত থেকে কীভাবে বের হবেন?

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

'যারা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়া শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করে না তারাই তো কাফের, তারাই তো জালেম, তারাই তো ফাসেক।'[১৪]

যারা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ শরীয়াহ অনুযায়ী ফায়সালা করে না আমরা তাদের হুকুম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব না। তাকফীর (কাফের আখ্যা দেওয়া) বা ইস্তিহলালের[১৫] মাসআলারও ফিরিস্তি টানব না। ফিকহী এতসব কঠিন বিষয়কে পাশ কাটিয়ে আমরা অন্তত এই বিষয়টির ওপর তো একমত হতে পারি যে, শরীয়াহ ব্যতীত অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসন করা অন্ততপক্ষে হারাম।

ইসলামপন্থীরা কি এই বাক্য কখনো মেনে নেবেন, "আমরা কিছুকাল শরীয়াহকে বাদ দিয়ে অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করব?" যদি এই বাক্য মেনে নিতে না পারেন, তাহলে তারা পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়নের কথা কীভাবে বলেন? আমার এই ভাইদের সমর্থনে কি কুরআনে এমন কোনো আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ শরীয়াহ অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাও সৎকর্মশীল, তারাও সফল কিংবা তাদের অপারগ বিবেচনা করা হবে!?

শরীয়াহ ছাড়া অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসন কি শুধু এই নষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপরই হারাম? শুধু উদ্দেশ্য ভালো হওয়ার দরুন কিংবা শরীয়াহ দ্বারা সামান্য কিছু শাসন করার কারণেই কি এটি ইসলামপন্থীদের জন্যে হালাল হয়ে যায়?

---

১৪. সূরা মায়েদা: ৪৪,৪৫,৪৭।

১৫. ইস্তিহলাল শব্দের অর্থ হলো, হালাল মনে করা। জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত কোনো অকাট্য হারামকে হারাম জানার পরও হালাল বা বৈধ মনে করা কুফরী। লেখক এখানে ইস্তিহলালের মাস'আলা বলে যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন তা হলো: কেউ শরীয়াহকে বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করাকে হারাম মেনে নেন ঠিকই, তবু এতৎসত্ত্বেও মানবরচিত আইন দ্বারাই শাসন করেন, এমন ব্যক্তির কুফরীর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য আছে। এমনকি খোদ ইস্তিহলালের উপরিউক্ত সংজ্ঞা নিয়েও কমবেশি মতানৈক্য চোখে পড়ে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পাঠক কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ থেকে সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াত অধ্যয়ন করতে পারেন।

আমার এই ভাইদের অনেকেই তো বড় গলায় বলতেন যে, "যারা শরীয়াহ ব্যতীত অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসন করবে তারা তাগুত, তারা বিধানপ্রণেতা হয়ে মানুষের প্রভুতে পরিণত হয়েছে।" যদি ইসলামপন্থীরা নির্দিষ্ট শতকরা হারে এভাবেই শরীয়াহ ছাড়া অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসন করেন তাহলে নিজেদের দেওয়া এই বিশেষণগুলো থেকে তারা নিজেরাই কীভাবে মুক্তি পাবেন? শুধু উদ্দেশ্য ভালো হওয়ার কারণে কিংবা শরীয়াহ দ্বারা সামান্য কিছু শাসন করার কারণেই কি তারা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে ছাড় পেয়ে যাবেন?

অতএব এই পর্বের সারকথা হলো, যখনই আমরা এই বাক্যটি শুনব যে, "আমরা পর্যায়ক্রমে ধীরেসুস্থে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করতে চাই" তখন এর বাস্তবিক অর্থ আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত হবে। আর এর বাস্তবিক অর্থটি হলো, আমরা পরিস্থিতির বিবেচনায় কিছুকাল আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া শরীয়াহকে বাদ দিয়ে অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতে চাই।"

কোন পর্যায়ক্রম সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনা?

এই সিরিজটি ধারাবাহিক করার পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি, যাতে কোনো ধোঁয়াশা আর থেকে না যায়। সেটি হলো: 'পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রয়োগ করা অনৈসলামী' বলতে আমি আসলে কী বোঝাতে চাই?

প্রথম তিন পর্ব আলোচনার পর আমার নিকট অনেক অনেক আপত্তি ও প্রশ্ন এসেছে যেগুলোতে কিছু ভাই কুরআন, সুন্নাহ ও সীরাতের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এটি প্রমাণের চেষ্টা করছেন যে বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রয়োগ' এর স্লোগানটি অনৈসলামী নয়; বরঞ্চ ইসলামিক। আর এটিকে অনৈসলামী বলে আমিই বরঞ্চ শরীয়তের বিভিন্ন দলিল উপেক্ষা করছি।

অথচ, পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে তারা যে দলিলগুলো নিয়ে আসছেন সেগুলো ভিন্ন দুটি বিষয়কে প্রমাণ করে। ১. হয়তো সেগুলো মানুষের নিকট শরীয়তের বিধান উপস্থাপনের সময় কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বর্ণনা করার দলিল। ২. নতুবা শরীয়তের কোনো বিধানকে শর্ত পরিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ছেড়ে দেওয়ার দলিল।

যেমন তারা প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হযরত মুয়াজ رضي الله عنه কে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে যে, যেন তিনি ইয়েমেনবাসীদের প্রথমে দুই কালিমার দিকে দাওয়াত দেন, তারপর নামাজের দিকে আর সর্বশেষ যাকাতের দিকে।

আমার ভাইয়েরা একে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়নের দলিল হিসেবে নিয়ে এসেছেন। অথচ এটি গণমানুষের সামনে শরীয়তের বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করার দলিল।

একইভাবে, 'ক্ষুধার্ত ফকীর যদি বাধ্য হয়ে চুরি করে তবে তার ওপর চুরির বিধান রহিত হওয়া' কিংবা 'অপারগতার অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর অন্যায় থেকে বাধা দেওয়ার আবশ্যকতা সরে যাওয়া' এই মাসআলাগুলোও আমার ভাইয়েরা তাদের দাবির প্রমাণ হিসেবে নিয়ে এসেছেন। অথচ এগুলো তাদের পক্ষের দলিল নয়; বরং শরীয়তের কোনো বিধানকে শর্ত পরিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ছেড়ে দেওয়ার দলিল।

আমার এই ভাইয়েরা প্রমাণগুলো এনে বর্তমানে ইসলামী মহলে পরিচিত 'পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগ' এর স্লোগানটির বৈধতা সাব্যস্ত করছেন আর বলছেন যে, আপনি এই পর্যায়ক্রমকে অস্বীকার করার মাধ্যমে ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ আরও তিনটি বিধান অস্বীকার করছেন:

১. গণমানুষের সামনে শরীয়তের বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করার বিধানকে আপনি অস্বীকার করছেন।

২. শরীয়তের কোনো বিধানকে শর্ত পরিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ছেড়ে দেওয়ার বিধানকে অস্বীকার করছেন।

৩. অপারগতার অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর থেকে কোনো আবশ্যকতা সরে যাওয়ার বিধানকে অস্বীকার করছেন। অথচ এগুলো সব ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ বিধান।

আমি আমার ভাইদের স্পষ্ট করেই বলি, আমি উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের একটিও অস্বীকার করছি না। বরঞ্চ এগুলোর বৈধতা আমি আগামী পর্বগুলোতে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে বর্ণনা করব। আমি এটিও বলছি না যে, নবগঠিত কোনো ইসলামী

রাষ্ট্রের ওপর সমাজকে প্রথম দিনেই পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বানিয়ে ফেলতে হবে, কিংবা একদাগেই সমস্ত পাপাচারকে উচ্ছেদ করতে হবে অথবা প্রথমবারেই ইসলামবিরোধীদের সাথে লড়াইয়ে নেমে পড়তে হবে।

কিন্তু একই সময়ে আমি বলছি, আপনারা যে দলিলগুলো পেশ করছেন সেগুলো 'পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রয়োগ'-কে সাব্যস্ত করে না। কেননা, যে 'পর্যায়ক্রম' এর সমালোচনা আমরা করছি কিংবা যেটিকে নাজায়েয বলছি সেটিতে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর এক বা একাধিক অবস্থা পাওয়া যাবে। যদি নিম্নোক্ত কোনো অবস্থা আপনার পদ্ধতিতে খুঁজে পান, তাহলে বুঝে নেবেন আমরা এরই বিরোধিতা করছি।

❋ শুরু থেকেই শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব বা একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ঘোষণা না দেওয়া। অর্থাৎ, শরীয়াহকে শুরু থেকে সমস্ত আইনের সর্বোচ্চ ভিত্তি হিসেবে গণ্য না করা।

❋ শরীয়াহ আইন প্রয়োগের জন্যে পার্লামেন্টের অনুমতির প্রয়োজন হওয়া।

❋ শরীয়াহ-বিরোধী মানবরচিত আইন সাময়িকভাবে গৃহীত হওয়া।

❋ পূর্ববর্তী অনৈসলামী শাসনের কোনো শরীয়াহ-বিরোধী আইন বর্তমানে বহাল রাখা।

❋ এমনভাবে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করা, যেন নতুন করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে।[১৬]

❋ প্রথমে অর্থনৈতিক কিংবা নিরাপত্তা-বিষয়ক সমস্যা সমাধানের পর তারপর শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের কথা বলা।

❋ শরীয়াহ প্রয়োগের আগে মানুষদের ইসলামী আকীদা ও চরিত্রগঠনের কথা বলা।

---

১৬. যেমন মদ প্রথমে বৈধ, তারপর ধীরে ধীরে অবৈধ করা। তিউনিসিয়ার ইসলামপন্থী দল আন নাহদা মুভমেন্টের প্রধান রাশেদ ঘানুশী বলেন: আমরা ক্ষমতায় আরোহণ করলে মদ ও বিকিনি নিষিদ্ধ করব না। দেখুন: https://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/7/15/الغنوشي-لن-يحظر-الخمور-والبكيني

❁ শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্যে ইসলামবিরোধী দেশীয় কিংবা বহিঃশক্তির সমর্থনের শর্ত জুড়ে দেওয়া।

❁ ক্ষমতায় আরোহণের লক্ষ্যে এমন কিছু বিষয়ে ছাড় দেওয়া, যার প্রভাব স্থায়ী হবে, কিংবা যদি তারা ক্ষমতায় যায় তবে শরীয়াহ বাস্তবায়ন না করার শর্ত থাকা।

বর্তমানে যে 'পর্যায়ক্রম' এর দিকে ডাকা হয় সেটিতে এই সমস্যাগুলো পাওয়া যায়। ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা একটি পর্বে ওপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি পয়েন্ট হারাম হওয়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করব। তবে এখন আমরা আপাতত ইসলামপন্থীদের পেশকৃত দলিল খণ্ডনে মনোযোগ দেব। তারপর পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করব ইনশাআল্লাহ।

হযরত মুয়াজের ﵁ হাদীসটি পর্যায়ক্রমের স্বপক্ষে দলিল নয়

আমাদের যে ভাইয়েরা পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগের সমর্থক তারা দলিল পেশ করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হযরত মুয়াজকে ﵁ ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে বলেছিলেন,

إنك ستأتي قومًا من أهل كتاب، فإذا جئتَهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائمَ أموالهم، واتقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجابٌ

'অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের নিকট যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের নিকট পৌঁছবে তখন তাদের এই দা'ওয়াত দেবে—তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল', এরপর তারা

যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদের এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামাজ ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদের সম্পদের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মাযলুমদের বদদুআকে ভয় করবে, কেননা মাযলুমের বদদুআ এবং আল্লাহর মাঝখানে কোনো আড়াল থাকে না।'[১৭]

আমার ভাইয়েরা, এখানে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগের অর্থ আপনারা কোথায় পেলেন? বরঞ্চ এই হাদীস তো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মানুষের নিকট শরীয়াহকে উপস্থাপনের সময় আমরা যেন কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বর্ণনা করার প্রতি লক্ষ রাখি। যেহেতু দুই কালিমা ইসলামের মূলভিত্তি, তাই এই দুই কালিমা স্বীকার করেনি এমন মানুষকে নামাজের দাওয়াত দেওয়া কখনোই প্রজ্ঞার কাজ হবে না। কালিমার পর নামাজের দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, কেননা সেটি ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। এভাবে অন্যান্যগুলো একের পর এক ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপর তারচেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

❁ এখানে নবীজি ﷺ কি হযরত মুয়াজকে বলেছিলেন: তুমি ইয়েমেনবাসীদের নিকট শরীয়াহ আইনে শাসন করার ঘোষণা দেবে না। কারণ, তাদের কিছু অংশ এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

❁ তিনি কি তাকে বলেছিলেন: ইয়েমেনবাসী নামাজ আদায় ও যাকাত প্রদান করার আগ পর্যন্ত তুমি তাদের পূর্বেকার শরীয়াহ-বিরোধী আইন বহাল রাখবে। তাদের প্রচলিত আইন দ্বারা শাসন করবে।

❁ নবীজি ﷺ কি হযরত মুয়াজকে বলেছিলেন: যদি ইয়েমেনবাসী তোমার আনুগত্য না করে, নামাজ না পড়ে তাহলে পরিকল্পনামাফিক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তাদের ওপর পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করতে থাকো। আর

---

১৭. সহীহ বুখারী: ১৪৯৬।

শরীয়াহ তাদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের অনুমতিসাপেক্ষে যতটুকু পার প্রয়োগ করো।

❀ তিনি কি তাকে বলেছেন: মুয়াজ, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে ইয়েমেনের প্রচলিত আইন বাতিল করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে পার।

❀ তিনি কি বলেছিলেন: যেহেতু কুরআন এক দফায় মদ হারাম করেনি তুমিও ইয়েমেনবাসীর ওপর এক দফায় তা হারাম করবে না।

❀ তিনি কি হযরত মুয়াজকে বলেছিলেন: ইয়েমেনে যদি তুমি দরিদ্রতা ও অশান্তি দেখতে পাও তাহলে আগে ক্ষুধার্তদের খাওয়াও, বেকারদের জন্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করো, তোমার অর্থনৈতিক পরাকাষ্ঠা দেখাও তারপর শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করো।

❀ তিনি কি বলেছিলেন: প্রথমে আকীদা ও চরিত্রগত বিষয়ে গুরুত্ব দেবে। আগেই শরীয়াহ প্রয়োগ করলে সেটি তাদের জন্যে কঠিন হয়ে যাবে। কেউ চুরি কিংবা ব্যভিচার করলে তাকে প্রচলিত আইনে শাস্তি দেবে।

❀ নবীজি ﷺ কি হযরত মুয়াজকে বলেছিলেন: শরীয়াহ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইয়েমেনবাসীর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবে। তাদের অধিকাংশের মতকে সম্মান জানাবে। যাতে তারা রোম-পারস্যের সাথে মিলে তোমার বিরোধিতায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে; তাই তাদের সন্তুষ্ট রাখবে।

❀ তিনি কি বলেছিলেন: ইয়েমেনবাসীকে এই কথা বোঝাও যে, যারা শরীয়াহ প্রত্যাখ্যান করবে তাদের ভিন্নমতের লোক হিসেবে নিরাপত্তা ও সম্মান দেওয়া হবে। এমনকি রাষ্ট্র গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা হবে।

এই বর্ণনা ছাড়াও আমাদের অজানা অন্য কোনো বর্ণনায় কি ওপরের কোনো কথা পাওয়া যায় কিংবা ভাবা যায় তিনি এমন কোনো আদেশ হযরত মুয়াজকে দেবেন?

আমার ভাইয়েরা, ইসলামের বিধান অসংখ্য ও অগণিত। কিন্তু নবী করীম ﷺ এই হাদীসে শুধু দুই কালিমা, নামাজ ও যাকাতের কথা বলেছেন। অন্যান্য কোনো বিধানের কথা বলেননি। তার মানে কি এই যে, ঘুষ, সুদ, মদ, চুরি ইত্যাদির বিধান হযরত মুয়াজের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তা বাস্তবায়ন করেন?

যারা পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগের প্রচারক তারা বলেন যে, শরীয়াহ প্রয়োগের আগে মানুষের আকীদাগত বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারা এই হাদীস থেকে তা প্রমাণ করতে চান। অথচ এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ আকীদাগত শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেটি হলো দুই কালিমা। বিষয়টি যদি এর ওপরই সীমাবদ্ধ হতো তাহলে আখেরাত, কিতাব, ফেরেশতা ও তাকদীরের ওপর ঈমান আনার আগেই হযরত মুয়াজের ওপর ইয়েমেনবাসীদের নামাজ ও যাকাতের আদেশ দেওয়া অত্যাবশ্যক হতো। কিন্তু এমনটা কি যৌক্তিক? আর এই হাদীসে কি এমন কোনো ইঙ্গিত আছে যে, তারা যদি কালিমা পড়ে হযরত মুয়াজের দা'ওয়াতে সাড়া না দেয় তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন?

অতএব আমার ভাইয়েরা, এই হাদীসের সাথে 'পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়ন'-এর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। একটু গভীর চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই যে, নবীজি ﷺ কোনো জাতিকে কিছু বিষয়ের আদেশ দিচ্ছেন আর কিছু থেকে নিষেধ করছেন। আর তাঁর এই আদেশ ও নিষেধ শুধু এগুলোর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ যখন নবীজির ﷺ নিকট আব্দুল কায়সের প্রতিনিধিদল এল তিনি তাদের চারটি বিষয়ের আদেশ দিলেন আর চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন।

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ. قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ. قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ . وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

'তিনি তাদের চারটি কাজের আদেশ দিলেন এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করলেন। তিনি বললেন: এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কীভাবে হয় জানো? তারা বলল: আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: তা হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযান-এর রোজা পালন করা আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি তাদের চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন, শুকনো কদুর খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা দ্বারা রং করা পাত্র ব্যবহার করতে।'[১৮] (অর্থাৎ, যেগুলো মদ তৈরির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো)

এই হাদীসে নবীজি ﷺ রোজা পালন করা আর গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মদ তৈরির পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এই বিষয়গুলো হযরত মুয়াজের হাদীসে আসেনি। এ থেকে কি কখনো এটা বোঝান হচ্ছে যে, ইয়েমেনবাসীর জন্যে এক প্রকারের পর্যায়ক্রম আর আব্দুল কায়সের প্রতিনিধিদলের জন্যে ভিন্ন প্রকারের পর্যায়ক্রম? অবশ্যই না। এই হাদীসগুলোর সাথে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আর এই আদেশ-নিষেধগুলোও এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বরঞ্চ হাদীসগুলো এই শিক্ষা দেয় যে, যদি আমাদের নিকট এমন কিছু মানুষ আসে যারা ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমাদের উচিত হবে এই বিধানগুলো তাদের নিকট সাজিয়ে কিছু বিষয়কে আগে উপস্থাপন করা। যাতে ইসলামের বিধানগুলো তাদের নিকট তালগোল পাকিয়ে না যায়, তখন এগুলো সব জেনে আমল করা তাদের জন্যে অকল্পনীয় ও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব এখন এটি স্পষ্ট যে, হযরত মুয়াজের رضي الله عنه হাদীসে ইয়েমেনবাসীদের জন্যে নামাজ তাৎক্ষণিক একটি নির্দেশ ছিল। যা শেখা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। ইসলামে প্রবেশের সাথে-সাথেই তারা নামাজের মুখাপেক্ষী। অপরদিকে কিন্তু রোজার বিধানগুলো একটু দেরি করে শেখানো সম্ভব। যেহেতু এর আবশ্যিকতা রমজানে, তাই রমজানের আগে করে শিখে নিলেও হবে। ঠিক এভাবে, হজ্জ পুরো জীবনে মাত্র একবার ফরজ। তাই এটি তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা এখন নেই। এ ক্ষেত্রে উসুলীগণ[১৯] একটি নিয়ম বর্ণনা করেন, শরীয়তের কোনো বিধান প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগ পর্যন্ত দেরি করে বর্ণনা করা জায়েয।

---

১৮. সহীহ বুখারী: ৫৩, নাসায়ী: ৫৭০৮।

১৯. উসুলে ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতি বিশারদদের উসুলি বলা হয়।

তা ছাড়া এই হাদীস থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বুঝতে পারি যে, ইয়েমেনবাসী শুধু কালিমা পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর নিঃশর্ত দাসত্বের কথা ঘোষণা দিয়েছে। তারা আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সামনে নত হয়েছে। এরপর তাদের যা-ই আদেশ দেওয়া হবে তারা তা পালন করবে। কেননা, এটি আল্লাহর আদেশ, যার একত্ববাদকে তারা স্বীকার করেছে। যত নতুন সমস্যা দেখা দেবে সবগুলোতে হযরত মুয়াজ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কারণ প্রভু, রব ও বিধানপ্রণেতা হিসেবে এই আল্লাহর একত্ববাদকে তারা মেনে নিয়েছে।

কিছু ভাই পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রয়োগের যে কথা তোলেন সেখান থেকে এই হাদীস কতটা দূরে! এটি তো শরীয়তের কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সাজিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন ও শিক্ষাদানের দলিল। আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর হুকুমের সামনে নতি স্বীকারের ক্ষেত্রে আবার কিসের 'পর্যায়ক্রম'! যখনই উভয় শাহাদাহ বাক্য পাঠ করে আল্লাহর নিঃশর্ত দাসত্ব ও আনুগত্যের ঘোষণা দেওয়া হবে সে সময় থেকেই শরীয়াহর পরিপূর্ণ প্রয়োগ শুরু হবে।

আমার ভাইয়েরা, যদি আমরা নবী-যুগ, খুলাফা-যুগ ও তৎপরবর্তীকালের ইসলামী বিজয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ করি, সেখানে কি ইসলাম ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? অর্থাৎ এমন কোনো ইতিহাস কি আছে যে, মুসলিমদের বিজিত কোনো অঞ্চলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করল তাহলে তাকে এক বছর মদ ও ব্যভিচারের অনুমতি দেওয়া হবে আর তারপর থেকে নিষিদ্ধ করা হবে? না, এমন কোনো নজির নেই। বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই যে, সবখানেই পরিপূর্ণ শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। বিজিত অঞ্চলে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটাই ছিল বিধিবদ্ধ নিয়ম।

অতএব এই পর্বের সারকথা হলো, হযরত মুয়াজের ﷺ হাদীসটি মূলত, যারা আল্লাহর আইনের সামনে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন তাদের নিকট শরীয়তের বিধান উপস্থাপনের সময় কিছু বিষয়কে আগে বর্ণনা করার দলিল। এই হাদীস থেকে শরীয়াহকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না।

কেন আমাদের বিষয়টি লাভজনক?

গত কয়েক পর্বে আমরা ইসলামপন্থীদের নিকট এই আবেদন পেশ করে আসছিলাম যে, তারা যেন শরীয়াহ প্রয়োগের প্রশ্নে কোনোরকম ছাড় না দেন। অনেকেই এই কথা থেকে এটা বুঝে নিয়েছেন যেন আমরা তাদের রাস্তায় নেমে মানুষদের সামনে এই ঘোষণা দিতে বলছি যে, "আমরা যদি শাসনক্ষমতা হাতে পাই তাহলে নারীদের ওপর হিজাব বাধ্যতামূলক করে দেব, মদ নিষিদ্ধ করব, চোরের হাত কাটব ও ব্যভিচারীদের প্রহার করব।"

কিন্তু বাস্তবে আমরা বরঞ্চ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীদের সতর্ক করে এটি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে, তারা যেন মৌলিক আলোচনা থেকে সরে এসে কিছু শাখাগত বিষয়ে ডুবে না থাকে। আকীদা বর্ণনা না করে কিছু বিধান নিয়ে পড়ে না থাকে। মনে রাখা উচিত, আমরা যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মী তাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকু নয় যে, আমরা জনগণের কিছু উৎকণ্ঠার জবাব দিয়ে যাব ও তাদের শরীয়াহ শাসন বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেই যাব। বরঞ্চ আমাদের এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, জনগণের নিকট স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই দাস। এই দাসত্ব পরিপূর্ণভাবে তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন আল্লাহর আইন তথা শরীয়াহ বাস্তবায়িত হবে। তাদের এই কথা পরিষ্কারভাবে বলা যে, যতক্ষণ তারা শরীয়াহর সামনে আত্মসমর্পণ না করবে ততক্ষণ তাদের ইসলাম শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট শাসনভার ন্যস্ত করা সবচেয়ে বড় শিরক।

যদি আমরা সারাক্ষণ বিস্তারিতভাবে শরীয়তের বিধান বর্ণনায় ব্যস্ত থাকি, হুদুদ বা ইসলামী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সেক্যুলারদের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি কিংবা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলির ক্ষেত্রে ইসলামের দেওয়া সমাধানের বুলি সব সময় আওড়াতে থাকি তাহলে ওপরে বর্ণিত দাসত্বের এই অর্থ আর বাকি থাকে না। কেননা, ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায়, যেন আমরা কিছু ব্যবসায়ী, যারা পণ্য সাজিয়ে রেখেছেন, যারা পণ্যের গুণাবলি বর্ণনা করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন। এমনিভাবে আমরাও যেন মানুষের সামনে শরীয়াহকে উপস্থাপন করছি যেন তা অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোই একটি ব্যবস্থা, সেখান থেকে স্বাধীনভাবে যেকোনো একটি গ্রহণ করা যায় কিংবা পার্থিব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় একে অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যায়।

অথচ মানুষের মাঝে আমাদের এই কথাটিই স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া উচিত ছিল যে: তোমরা কি আল্লাহর ওপর ঈমান আনোনি? যদি এনে থাকো তাহলে আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বলো:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেবেন তখন কোনো ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই।'[২০]

অতএব হে আমার জাতি, শরীয়াহর কোনো বিকল্প নেই, এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো অপশন নেই।

আমরা তো এমন কোনো পণ্য বিক্রয় করছি না, যার সব দোষগুণ আমাদের বর্ণনা করতে হবে, যাতে ক্রেতা পরবর্তী সময়ে ধোঁকাবাজ বলে গালি না দেয়; বরঞ্চ আমরা মুসলিম উম্মাহকে শরীয়াহর দিকে আহ্বান করে তাদের কালিমার বশ্যতা স্বীকার করার আবেদন করছি, যে কালিমা তারা পাঠ করেছিল। আর কালিমার অর্থই হলো, আল্লাহকে প্রভু, বিধানপ্রণেতা ও শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ক্ষেত্রে তোমার নিকট শাসনভার ন্যস্ত না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেবে।'[২১]

অতএব, আমরা তো এমন কোনো সংকীর্ণ স্থানে নেই যে নিজেদের যুক্তির আশ্রয়ে নিয়ে বাঁচাতে হবে; বরং যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে তারপর শরীয়াহ আইনকে প্রত্যাখ্যান করে, তারাই নিফাক ও বৈপরীত্যের গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে আছে।

---

২০. সূরা আহযাব: ৩৬।
২১. সূরা নিসা: ৬৫।

আগে বর্ণিত মুয়াজ ﷺ এর হাদীস থেকে আমাদের এই বিষয়টিও বোধগম্য হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ হযরত মুয়াজকে এই নির্দেশনা দেননি যে, তিনি ইয়েমেনবাসীর সামনে শরীয়াহকে একটি স্বাধীনতা হিসেবে পেশ করবেন। তারা এই বিকল্পটিকে পড়বেন, অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে তুলনা করবেন, তারপর ভালো মনে হলে গ্রহণ করবেন আর নাহয় ছেড়ে দেবেন; বরং ইয়েমেনবাসী যখনই উভয় কালিমা ও শাহাদাহ পাঠ করে সাক্ষ্য দেবে তখন থেকেই তাদের ওপর শরীয়াহর সামনে আত্মসমর্পণ করা ও একে বাস্তবায়ন করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পথ বাকি থাকবে না।

অতএব আমার ভাইয়েরা, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, শরীয়াহ সমাজের বিভিন্ন সমস্যার যে সমাধান দিয়েছে কিংবা পার্থিব সুখের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে এর মাধ্যমে শরীয়াহকে বাজারজাত করা মোটেও সমীচীন নয়। এই সমাধান ও সুখ মূলত একনিষ্ঠতা ও সততার সাথে শরীয়াহ বাস্তবায়নের ফল। এগুলো শরীয়াহর বিশেষত্ব নয়; বরং এর বিশেষত্ব হলো, এটি আল্লাহর দীন।

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

'আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের কোনো একটিও করতে পারবে?'[২২]

এই সেক্যুলাররা কি সৃষ্টি করতে পারে? রিযক দিতে পারে? জীবিত বা মৃত করতে পারে? কিংবা পার্লামেন্ট কি এগুলোর একটিও করতে পারে? যদি না পারে তাহলে আইন প্রণয়ন করে কোন ক্ষমতায়?

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

'তারা যার সাথে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।'[২৩]

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, যদি আমরা এই ঘোষণা দিয়ে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চাই যে, এর মাধ্যমে সমাজের সকল সমস্যা দূরীভূত হবে আর

---

২২. সূরা রোম: ৪০।
২৩. সূরা আনআম: ১০০।

পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হবে। এরপর আমাদের এই ঘোষণার কারণে মানুষজন যদি শরীয়াহ কায়েম করে তাহলে কি সত্যিকারার্থেই আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব? কক্ষনো না। কেননা, শরীয়াহ বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর ইবাদত। যদি মানুষজন একে দুনিয়াবি স্বার্থেই বাস্তবায়ন করে তাহলে দাসত্বের অর্থ আর বাস্তবায়িত হলো কই?

তারপরও যদি ধরে নিই, এই ঘোষণা দেওয়ার পর কোনো দেশে সত্যিই শরীয়াহকে বেছে নেওয়া হলো, নিশ্চয় পরবর্তী সময়ে তাদের ত্যাগের এমন একটি সময় পার করতে হবে যেখানে ইসলামবিরোধী শিবির থেকে আসা সমস্ত আক্রমণ তাদের বুক পেতে নিতে হবে। আর এই সময়টাতেই সে সমস্ত লোকেরা পিছু হটতে বাধ্য হবে, যারা শরীয়াহকে শুধু দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করেছিল।

আমার ভাইয়েরা, এটি আল্লাহ তাআলার দীন। ক্রেতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যের সারিতে সাজিয়ে রাখা থেকে এই দীন অনেক ঊর্ধ্বে।

এই সিরিজে আমরা ধাপেধাপে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করব যে, শরীয়তে এমন কোনো বিষয় নেই, যা থেকে আমাদের লজ্জা পেতে হবে; বরং ওয়াল্লাহি! এই শরীয়াহর প্রত্যেকটি দিক এমন, যার মাধ্যমে আমরা গৌরবে মাথা উঁচিয়ে রাখতে পারি। ইসলামী দণ্ডবিধির সৌন্দর্য ও এর অনুগ্রহের বিষয়টিও আমরা সামনের পর্বগুলোতে আলোচনা করব। তবে আমাদের এটি মনে রাখা উচিত হবে, শুধু এই সৌন্দর্যের কথা বলেই জাতিকে আশ্বস্ত করা উচিত নয় এবং এই শ্রেষ্ঠত্বগুলোকেই শরীয়াহর বিশেষত্ব বলে একে বাজারজাত করা জায়েয নয়। আমরা কি মহান আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে তুলনা করব এই বস্তাপচা নিকৃষ্ট মানবরচিত আইনের সাথে!?

আরবী কবি সুন্দর বলেছেন:

ألم تر أن السيف ينقص قدره

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

তুমি কী দেখো না, তরবারির মান তখন কমে যায়!

যখন বলা হয়: তরবারি লাঠির চেয়েও ধারালো।

এই শরীয়াহর বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আল্লাহর দীন।

﴿أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

'আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শাসক মানব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিস্তারিত আকারে কিতাব অবতীর্ণ করে দিয়েছেন?'[২৪]

আচ্ছা কোনো কু-তার্কিক যদি এই প্রশ্ন করে বসে যে, কেউ যদি শরীয়াহর বিরোধিতা করে তাদের সাথে তোমাদের আচরণ কেমন হবে? তাকে জবাব দিতে হবে: সে কেন বিরোধিতা করতে যাবে? এখনো শরীয়াহ প্রয়োগই হয়নি শুরুতেই বিরোধিতা!

এ-সমস্ত প্রশ্ন যারা করে তাদের উদ্দেশ্য ভালো হয় না।

আমার ভাইয়েরা, নবী করীম ﷺ এর হাতে যখন সাহাবায়ে কেরাম বায়আত হচ্ছিলেন তখন তারা কেউ তাকে এই প্রশ্ন করেননি যে, "যদি আমরা শরীয়তের বিধিবিধান অমান্য করি তাহলে আমাদের সাথে আপনার আচরণ কেমন হবে। বায়আতের আগে আমাদের বিষয়টি জানিয়ে দিন।"

কারণ, তারা জানতেন এটি এমন একটি প্রশ্ন, যা জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। এ ধরনের প্রশ্নের কারণে বায়আতের ওপর সত্যিই তারা আন্তরিক কি না সে প্রশ্ন ওঠে।

ইসলামবিরোধীরা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সমাধানে আমাদের ব্যস্ত রাখতে চায়। শরীয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা থেকে বিরত রাখতে চায়। আমাদের স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা উচিত যে, শরীয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আল্লাহর দেওয়া বিধান। যিনি মানুষের প্রতি অধিক কল্যাণকামী, তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আমার ভাইয়েরা, এই একটি বৈশিষ্ট্যই আমাদের সফল করবে। আর এ বিষয়টির দিকেই আমাদের সমস্ত গুরুত্বকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত।

অতএব, যখন শরীয়াহকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে আমরা জনগণের সামনে উপস্থাপন করব তখন আমাদের উচিত হবে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পেছনে নিজেদের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় না করা। আপনি বলতে পারেন: তখন তো শরীয়াহ-বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলবে, তোমরা গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছ।

---

২৪. সূরা আনআম: ১১৪।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই বিরোধীদের কোনোভাবেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়, একমাত্র তাদের দলে ভিড়ে যাওয়া ছাড়া। যদি আমরা তাদের কথাগুলোর প্রত্যুত্তরে সময় ব্যয় না করে আল্লাহর দাসত্বের বিষয়টিতে মনোযোগ দিই, তারা হয়তো শুধু এটুকুই বলবে যে, আমরা গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছি। কিন্তু যারা তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবে কিংবা তাদের সাথে তর্কে জড়াবে, এই তর্কে তখন আল্লাহর দাসত্বের বিষয়টি চাপা পড়ে যাবে। ইসলামবিদ্বেষীরা এদের ভিন্নমতের প্রতি সম্মানের কথা বলে ভুলিয়ে গণতন্ত্রের চোরাবালিতে প্রবেশ করাবে এবং সুযোগ পেলে তাদের নিঃশেষ করে দেবে। অতএব, আমাদের উচিত সুস্পষ্টভাবে হককে আঁকড়ে ধরা। একমাত্র তখনই আল্লাহর ছায়া আমাদের ওপর অটুট থাকে।

এই পর্বের সারকথা হলো, শরীয়াহ কোনো বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থা নয় যে একে অন্যান্য মানবরচিত আইনের সাথে তুলনা করা যাবে; বরঞ্চ শরীয়াহর বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সেই আল্লাহর দীন, যিনি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের রিযকদাতা, আমাদের জন্ম ও মৃত্যুদাতা।

দুর্ভিক্ষের বছর
চুরির শাস্তি স্থগিত করার ঘটনায় সৃষ্ট সংশয়

আগের একটি পর্বে আমরা বর্ণনা করেছি, যারা পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগের সমর্থক তারা এর সমর্থনে যত দলিল নিয়ে আসেন সেগুলো মোটেও বিষয়টিকে সাব্যস্ত করে না; বরঞ্চ তাদের দেওয়া দলিলগুলো নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের যেকোনো একটিকে প্রমাণ করে:

❋ মানুষের সামনে শরীয়াহ উপস্থাপনের সময় কিছু বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে বর্ণনা করা। এই বিষয়টি আমরা আগের দুটি পর্বে বিস্তারিতভাবে বলেছি।

❋ কোনো ইসলামী আইন প্রয়োগের শর্ত পরিপূর্ণভাবে না পাওয়া যাওয়ার কারণে আইনটি বাস্তবায়ন না করা। সে সময় অন্য আরেকটি শরীয়াহ আইনের ওপর আমল করা। এই পর্বে বিষয়টি নিয়েই আমরা আলোচনা করব।

আমার ভাইয়েরা, এই সিরিজটি রচনার সময় আমার নিকট যে প্রশ্নটি বারবার এসেছিল তা হলো, দুর্ভিক্ষের বছর হযরত উমর ﷺ চুরির শাস্তি স্থগিত করে দিয়েছিলেন। দেখুন এই মাসআলাটিকে আমার ভাইয়েরা কীভাবে বুঝেছেন: 'যখন হযরত উমর ﷺ দেখতে পেলেন জনগণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত, তারা জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে চুরি করছে তখন তিনি তার মাথা খাটালেন। শরীয়াহকে একপাশে রেখে নিজের বিবেক অনুযায়ী শাসন করলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সময়ে শরীয়াহ প্রয়োগ করা অসম্ভব।' এ ধরনের বুঝ অনেক বড় ভুলের কারণ।

প্রথমে একটা বিষয় বলে রাখা উচিত, দুর্ভিক্ষের বছর চুরির শাস্তি স্থগিত করে দেওয়ার ঘটনাটি হযরত উমর থেকে সাব্যস্ত নয়। ইবনে আবী শাইবাহ হতে বর্ণিত এই ঘটনাটিতে দুই জন বর্ণনাকারী 'মাযহুল', যা শাইখ আলবানী তার রচিত গ্রন্থ ইরওয়াউল গলীলে উল্লেখ করেছেন।[২৫]

তবু আমাদের আলোচনায় এই বিষয়টি প্রভাব ফেলবে না। এখন আসুন মূলকথায়, যদি সত্যিই মানুষ দুর্ভিক্ষের বছর ক্ষুধায় নিরুপায় হয়ে চুরি করে বসে তাহলে হযরত উমরের ওপর অবশ্যকর্তব্য হলো চুরির বিধান বাস্তবায়ন না করা। কেন? কারণ, শরীয়াহ তাকে নির্দেশ দেয় এমন অবস্থায় চুরির বিধান কার্যকর না করতে। আর চুরির বিধান কার্যকর করতে হলে অবশ্যই এর শর্তগুলো পূরণ হতে হবে, যা সহীহ হাদীস থেকে সাব্যস্ত। শর্তগুলো হলো:

- চুরিকৃত বস্তু গোপনে নিতে হবে।
- চুরিকৃত সম্পদ সম্মানিত হতে হবে, হারাম বস্তু হতে পারবে না।
- চুরিকৃত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের হতে হবে।
- চুরি সুরক্ষিত স্থান থেকে হতে হবে।
- দুই জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দিতে হবে কিংবা নিজেই দুইবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে।
- যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে তার মামলা করতে হবে।

---

২৫. ইরওয়াউল গলীল: ২৪২৮ (৮০/৮)।

❋ চুরিকৃত সম্পদে চোরের কোনো শুবহা (মালিকানা বা দাবি) থাকতে পারবে না।

এই শর্তগুলোর কোনো একটিও যদি অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে চোরের হাত কাটা বিচারকের জন্যে জায়েয হবে না।[২৬]

শর্তগুলোর একটি হলো, চুরিকৃত সম্পদ একটি নির্ধারিত পরিমাণের হতে হবে। পরিমাণটি হলো, এক স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ। এক স্বর্ণমুদ্রায় স্বর্ণ থাকে চার গ্রাম ও এক-চতুর্থাংশ। এ হিসেবে স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ হলো প্রায় এক গ্রাম স্বর্ণ। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে এর মূল্য ৩০০ মিসরীয় পাউন্ডের চেয়েও বেশি, আমেরিকান হিসেবে ৫০ ডলারেরও বেশি।[২৭]

স্পষ্ট কথা, যে খাবার না পেয়ে চুরি করবে সে নিশ্চয় এত বড় অঙ্ক কিংবা সে পরিমাণ খাবার চুরি করবে না। আর শরীয়াহ শুধু একটুকরো রুটি ও গোশত চুরির অপরাধে হাত কাটার নির্দেশ দেয় না, বিশেষ করে যখন ক্ষুধা নিবারণ করা হচ্ছে তখন তো প্রশ্নই ওঠে না।

আচ্ছা তবুও যদি ধরে নিই, দুর্ভিক্ষের বছর খাবারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটল। সে কারণে দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় এত বড় অংশ চুরি করল যা উপরিউক্ত পরিমাণকেও ছাড়িয়েছে। এই সময়েও শরীয়াহ চোরের ওপর শাস্তি প্রয়োগ থেকে বাধা দেবে। কারণ, চোরের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করার আরেকটি শর্ত হলো, চুরিকৃত সম্পদে চোরের কোনো শুবহা[২৮] থাকতে পারবে না। যেহেতু চোর চুরি করতে বাধ্য হয়েছে, এটিও একটি শুবহা, যার কারণে শরীয়াহ হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করতে বাধা দেবে। কেননা, সে দরিদ্রতা ও ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে চুরি করেছে।

---

২৬. এ-সংক্রান্ত বিষয়ে চার মাযহাবের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ: চুরি অধ্যায় (২৯৫/২৪)।

২৭. বাংলাদেশি হিসেবে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা। বিস্তারিত দেখুন, আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ: ১৭৬/১৩।

২৮. 'শুবহা' শব্দটিকে সহজ ভাষায় বললে, চুরিকৃত সম্পদে চোরের মালিকানার কোনো ধরনের গন্ধও থাকতে পারবে না। যেমন, দুর্ভিক্ষের সময়ে ধনীর সম্পদে দরিদ্র লোকের অধিকার তৈরি হয়। যেহেতু চোর তার অধিকারের সম্পদ থেকেই চুরি করছে সে ক্ষেত্রে এই অধিকার হলো শুবহা। ঠিক একইভাবে, যৌথ সম্পদের কোনো অংশীদার ব্যক্তি পুরো সম্পদ চুরি করলে এই অংশীদারত্বও একটি শুবহা। বাবা সন্তানের সম্পদ চুরি করল, নৈকট্যও একটি শুবহা। বিস্তারিত দেখুন, আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ: ৩০২/২৪।

অতএব, আমার ভাইয়েরা, এই ঘটনাটিকে খুব সাধারণ করে ব্যাখ্যা করলে এমন দাঁড়ায় যে, শরীয়াহই হযরত উমরকে নিরুপায় চোরের ওপর শাস্তি প্রয়োগ থেকে বাধা দিয়েছে। এই আইনটি শরীয়াহরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত উমর শরীয়াহ আইন স্থগিত করে নিজ থেকে বিবেক খাটিয়ে এমনটা করেছেন বিষয়টি এমন নয়। অতএব এই ধরনের অবস্থায় শরীয়াহ যেখানে প্রয়োগই হচ্ছে না, সেখানে হযরত উমর তা বাতিল করবেন কীভাবে!

হযরত উমর বলেননি যে, "এই বছর আমরা শরীয়াহ আইনের বাইরে গিয়ে নিজ থেকে মানবরচিত আইন প্রয়োগ করব। কেননা, এই অবস্থায় শরীয়াহ আইন প্রয়োগ অসম্ভব।" বরঞ্চ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি শুধু শরীয়াহর দ্বারস্থই হয়েছেন, নিজের মনোপ্রবৃত্তির নয়। কেননা, যে ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে, প্রাণধারণের তাগিদে চুরি করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে চোরের শাস্তি নির্ধারণ করেননি। এটি তো খুবই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, সাধারণ অবস্থায় যা অবৈধ প্রয়োজনের সময় তা মানুষদের জন্যে বৈধ করা হয়। তাই কেউ যদি খাওয়ার উপযুক্ত কিছুই না পায় তাহলে তার জন্যে মৃতজন্তু, রক্ত ও শূকর খাওয়া জায়েয। যদি ধনীরা তাকে স্বেচ্ছায় খাবার না দেয় তাহলে ক্ষুধার্ত ফকীরের জন্যে জীবন ধারণের তাগিদে চুরি করা জায়েয।

অন্য অর্থে ভিন্নভাবে বললে, যদি হযরত উমর ﷺ এই সংকটাপন্ন অবস্থাতেও চুরির শাস্তি প্রয়োগ করতেন তাহলে তিনি গুনাহগার হতেন। আবার পড়ুন, যদি হযরত উমর ﷺ এই দুর্ভিক্ষকালে নিরুপায় চোরের ওপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করতেন তাহলে তিনি গুনাহগার হতেন। কেননা, এমন অবস্থায় শাস্তি প্রয়োগ সম্পূর্ণ শরীয়াহবিরোধী কাজ।

আচ্ছা, কোনো মুসলিম যদি অপর মুসলিমকে ভুলে হত্যা করে ফেলে, শরীয়তে তার বিধান কী? তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে আর মৃতব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[২৯] কিন্তু তাকে কি হত্যা করা হবে? অবশ্যই না। কারণ, সে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। এখন শাসক এসে যদি তাকে হত্যা করে তাহলে কি এটা ন্যায়বিচার হলো? না; বরঞ্চ তাকে হত্যা করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় কি আমরা বলব : যেহেতু হত্যাকারী ভুলে এমন কাজ

---

২৯. বিস্তারিত দেখুন, সূরা নিসার ৯২ নং আয়াতের তাফসীর।

করেছে তাই তাকে বাঁচাতে শাসকের উচিত শরীয়াহ আইন স্থগিত করা? অবশ্যই না; বরং তাকে বাঁচানো যাবে শরীয়াহ আইনের মাধ্যমেই। আমরা এমন অবস্থায় বলব: হত্যাকারীর কাছ থেকে কিসাস নেওয়ার শর্ত হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা। যেহেতু সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেনি, তাই শর্তও পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি। এখন তাকে শরীয়াহর আরেকটি বিধানের আওতায় শাস্তি দেওয়া হবে। আমাদের ওপরে বর্ণিত ব্যাপারটাও এমন। নিরুপায় চোরের শাস্তি হাতকাটা নয়; বরঞ্চ শরীয়াহ নিজেই তার ওপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ থেকে বাধা দেয়।

আমার ভাইয়েরা, যেমনটা দেখলেন এটি সম্পূর্ণ ফিকহী বিষয়। শরীয়াহকে বাদ দিয়ে বিবেক খাটানোর বিষয় নয়। আরেকটি প্রশ্ন তো এমনিতেই জাগে, হযরত উমরের এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার চৌদ্দ শ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও কি আমরা কোনো আলেমকে বলতে শুনেছি যে, এই ঘটনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ আইন প্রয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়? কিংবা সালফে সালেহীনের কেউ কি এমনটা বলেছেন? কোনো ইমাম কি এমনটা বুঝেছেন? ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইমাম গাজ্জালী, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵏ কেউ? না।

বরঞ্চ এই মাসআলার বর্ণনায় ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﵀ ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন গ্রন্থে কী লিখেছেন দেখুন: "যদি কোনো বছর এমন দুর্ভিক্ষ কিংবা প্রয়োজন দেখা দেয় যে সময় মানুষ জীবন ধারণের তাগিদে চুরির পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে, তখন সম্পদশালীদের ওপর দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা ওয়াজিব। স্বল্পমূল্যে নাকি বিনামূল্যে সে ব্যাপারে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো, বিনামূল্যে বিতরণ করা। সহমর্মিতা, প্রাণ বাঁচানোর সক্ষমতা থাকা ও অভাবীদের প্রয়োজন মেটানোর দিকে লক্ষ রেখে।"

অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের সময়ে বিত্তশালীদের ওপর স্বেচ্ছায় গরিবদের দান করা ওয়াজিব। এই সময়ে ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার থাকে।

তিনি আরও বলেছেন : "আর এই অধিকারের কারণেই মূলত প্রয়োজনের সময় চোরের হাত কাটার বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, সে সময় তার জন্যে সম্পদশালীর সাথে লড়াই করে খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার অনুমতি আছে, যা তার ক্ষুধা মেটাবে।"

অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের বছর বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই পরিমাণ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, যা তার ক্ষুধা মেটাবে, তাহলে এটি তার জন্যে জায়েয হবে।

ইবনুল কায়্যিম ﷺ আরও বলেন : "দুর্ভিক্ষের সময়ে অভাবীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। সে সময় এটা পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে যে, কে প্রয়োজনবশত চুরি করছে আর কে প্রয়োজন ছাড়া চুরি করছে। তাই কার ওপর শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব আর কার ওপর সম্ভব নয় সেটি পার্থক্য করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এই কারণে সে বছর শাস্তির বিধান স্থগিত রাখা হয়।"

অর্থাৎ, সে বছর যদি হযরত উমর ﷺ সাধারণভাবে শাস্তি স্থগিত করেও থাকেন তাহলে তা এই কারণে যে, কে ইচ্ছা করে চুরি করেছে আর কে বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে করেছে সেটা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন : "হাঁ, যদি এটি স্পষ্ট হয় যে, চোর কোনো প্রয়োজন ছাড়া চুরি করেছে তাহলে তার হাত কাটা হবে।"[৩০]

দেখুন, যদি ধরেও নিই, সে বছর হযরত উমর ﷺ সাধারণভাবে চুরির শাস্তি স্থগিত করেছিলেন তার মানে এই নয় যে সমস্ত চোরের জন্যেই তিনি তা স্থগিত করেছেন। বরঞ্চ তখনো যদি এটি প্রমাণিত হতো, অমুক লোক প্রয়োজন ছাড়াই চুরি করেছিল, আর তার মধ্যে ওপরে বর্ণিত শাস্তি প্রয়োগের সমস্ত শর্ত পরিপূর্ণ পাওয়া গেছে তাহলে এই বছরেও তার ওপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ হতো।

অতএব আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ তার শরীয়াহকে এমন উদার করেছেন, যা মানুষের সমস্ত অবস্থাকে বিবেচনায় রাখে। নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে কিংবা অজ্ঞতাবশত মানুষ কোনো কাজ করে ফেললে সেদিকটিও বিবেচনা করে। অতএব, মানুষের জন্যে সহজ তখনই হবে যখন শরীয়াহকে কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই প্রয়োগ করা হবে।

শরীয়াহ কঠোর হওয়ার কারণে যারা জনগণের ওপর দয়ার্দ্র হয়ে শরীয়াহ বাতিল করতে চান, হয়তো তারা শরীয়াহ আইন ও এর দূরদর্শিতা সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা তারা নিজেদের খোদার বান্দাদের ওপর খোদার চাইতেও অধিক দয়ালু ভাবে!

---

৩০. ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন: ৩৫২/৪। দারু ইবনিল জাওযী।

এমন অনেক পরিবেশ আছে যেখানে শরীয়তের বিধিবিধান পৌঁছেনি। যেমন, মিসরের উপরাঞ্চলের কিছু শহরে আমরা এমন অনেক মানুষ দেখেছি, যারা সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না, নবীজির নাম তারা কখনো শোনেনি। এই পচনধরা নষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার তৈরি মূর্খতা নামক দেয়ালের কারণে। তো কখনো ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যদি এই অঞ্চলগুলোতেও পৌঁছে যায়, যদি এসে দেখা যায় যে, এখানের মানুষেরা মদ্যপান করে, হাশীশে অভ্যস্ত, সুদি কারবারে ব্যস্ত আর তারা এগুলোকে হারাম বলেও জানে না। তখন কি সে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা শুরু করবে? অবশ্যই না। কেন? কারণ, এরা তো বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ ও হারাম পর্যন্ত জানে না। এই পাপিষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ শাসন করার দরুন তারা এমন দরিদ্র ও মূর্খ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে যেখানে জ্ঞানচর্চা হয় না। কোনো হারামের কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়ার শর্তগুলোর একটি হলো, হারাম কাজে জড়িত ব্যক্তির জানতে হবে যে, কাজটি হারাম।[৩১] তখন ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর কর্তব্য হবে, শাস্তির বিধান প্রয়োগ না করে বরঞ্চ এই অঞ্চলের মানুষদের হারাম কাজগুলো কী কী সে শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাদানের পর যদি কেউ মদ্যপান করে তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ হবে। কারণ, এ সময় সমস্ত শর্ত পরিপূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে।

যদি এমনটা কখনো হয় যে, কোনো ইসলামী রাষ্ট্র এসে যারা বাধ্য হয়ে চুরি করছে তাদের হাত কাটতে আরম্ভ করল, কিংবা মদ্যপান নিষিদ্ধ জানে না এমন মদ্যপকে বেত্রাঘাত করল তখন আমরাই তার বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হব। তাদের বিরুদ্ধে এ রকম আরেকটি সিরিজ রচনায় আবার মনোযোগ দেব।

অতএব বোঝা গেল, শর্ত পরিপূর্ণ পাওয়া যায়নি এমন আইন বাস্তবায়ন করা কিংবা সময়োপযোগী আইন প্রয়োগ না করাও শরীয়াহকে বাতিল করার নামান্তর। অজ্ঞতা ও বাধ্য হওয়ার অজুহাতকে বিবেচনা না করাও শরীয়াহ বিরোধিতার শামিল। যাকে প্রহার করা উচিত নয় তাকে প্রহার করা কিংবা যাকে শাস্তি না দেওয়া প্রয়োজন তাকে শাস্তি দেওয়াও শরীয়াহকে স্থগিত করার নামান্তর। কোনো সরকার যদি এমনটা করে তাহলে আমরা তা কখনোই মেনে নেব না।

---

৩১. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

এই পর্বের সারকথা হলো, হযরত উমর ﷺ মূলত শরীয়াহর ওপর আমল করেই দুর্ভিক্ষের বছর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করেননি। কেননা, শাস্তি বাস্তবায়ন করার সবগুলো শর্ত এখানে পরিপূর্ণ পাওয়া যায়নি। আর হযরত উমর ﷺ শরীয়াহ আইন স্থগিত করে নিজের বিবেক খাটিয়ে এমনটা করেছেন কথাটি সঠিক নয়।

তিন ব্যক্তির উদাহরণ ও শরীয়াহ্ বাস্তবায়ন

কল্পনা করুন, তিন ব্যক্তি ঘরে ফিরে এসে আগুন দেখতে পেল। তাদের প্রত্যেকেরই ঘরের অবস্থা নিম্নরূপ: বাগানে পানি খুবই স্বল্প, আর যারা আগুন লাগিয়েছে তারা এমনভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে যে আগুন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। প্রতিবেশীরাও সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। আগুন সন্তানদের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে, ধোঁয়ায় স্ত্রীর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। আগুন ধীরে ধীরে গুদামঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে জীবনের সমস্ত সহায়সম্বল সংরক্ষণ করা আছে।

এমন অবস্থায় তিন জনই মোটামুটি হতভম্ব। কেউ জানে না কী করবে। প্রথমে কি আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাবে? এই স্বল্প পানি দিয়ে কোথা থেকেই-বা শুরু করবে? নাকি যারা আগুন জ্বালিয়েছে তাদের সাথে লড়বে? নাকি স্ত্রীকে বাঁচাবে? নাকি কক্ষে আবদ্ধ সন্তানদের রক্ষা করবে? নাকি জীবনের সঞ্চিত সহায়সম্বলের দিকে মনোযোগ দেবে? নাকি কঠিনপ্রাণ এই প্রতিবেশীদের কাছে স্ত্রী-সন্তানদের প্রাণভিক্ষা চাইবে?

এখন তিন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ লক্ষ করুন:

প্রথমজন যখন স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে দেখল তাকে উদ্ধার করল। অথচ সে সময় স্ত্রী ঘরোয়া পোশাক পরিহিত ছিল আর অনেক পরপুরুষ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছিল। আবার অন্যদিকে জীবনের সঞ্চিত সহায়সম্পদের মায়া ছেড়ে দিয়ে তার অবরুদ্ধ সন্তানদেরও আগুন থেকে বের করে আনলো। প্রথমজন কি কোনো ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে? অবশ্যই না। সে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রীকে বোরকায় ঢেকে বের করার চেয়ে তাকে জীবিত বের করা অধিক গুরুত্বের, এভাবে সম্পদ রক্ষার চেয়ে সন্তানদের জীবন রক্ষা করা অধিক গুরুত্বের।

আবার দ্বিতীয়জন, সম্পদের দিকে ধাবিত আগুন নেভানোর বন্দোবস্ত করল, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে থাকা স্ত্রী ও অবরুদ্ধ হয়ে থাকা সন্তানদের ছেড়ে দিল। তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়ল, লম্বা লম্বা সিজদা দিল আর আল্লাহর নিকট দুয়া করতে লাগল যেন তিনি গায়েবী সাহায্যে আগুন নিভিয়ে দেন। এই লোকটি কি ভুল কিছু করেছে? অবশ্যই করেছে। জীবনরক্ষার ওপর সম্পদরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে, নামাজ আল্লাহর অধিকতর প্রিয় বস্তু হওয়া সত্ত্বেও তার কারণে যেহেতু লোকটি স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব থেকে পিছু হটেছে তাই এমন সময়ে নামাজ পড়া তার জন্যে কোনোভাবেই জায়েয ছিল না।

অপরদিকে তৃতীয়জনের স্ত্রী ছিল ধূমপায়ী, আর সন্তানেরা কম্পিউটার গেইমসে আসক্ত। প্রতিবেশীরা তাকে পছন্দ করত না কারণ সে তাদের তার ঘরে গান ও মদের আসর বসাতে বাধা দিত। আর এখন যারা তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তারা মূলত এই লোকটির নিকট তার স্ত্রীকে একরাতের জন্যে ভাড়া চেয়েছিল। সে না করে দিয়েছিল বিধায় আজকে এই অবস্থা।

তো এখন লোকটি স্ত্রী-সন্তানকে বাঁচাতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করল। সে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে চিৎকার করে বলল, আগুন হতে তোমাকে বের করতে আমায় সাহায্য করো। কথা দিচ্ছি, ধূমপান থেকে তোমাকে আর বাধা দেব না।

সন্তানদের বলল, তোমাদের আগুন থেকে বের করতে যদি তোমরা আমায় সাহায্য করো, কথা দিচ্ছি কম্পিউটারে গেইমস খেলতে আমি তোমাদের অনুমতি দেব। এমনকি আমিও তোমাদের সাথে বসে বসে খেলব।

এভাবে সে প্রতিবেশীদের বলল, আমাকে এখন তোমরা সহযোগিতা করলে আমি তোমাদের মদ ও গানের আসরের অনুমতি দেব।

আগুনে ইন্ধনদাতাদের বলল, তোমরা আগুন থামিয়ে দাও, এক রাত ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে দেখব। এই তৃতীয় ব্যক্তি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সে ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? আচ্ছা আজকের এই পর্বে আমরা শুধু প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকি। এই তিন জনের উদাহরণ আপাতত মনে রাখুন, সামনের পর্বগুলোতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামপন্থীদের নিকট আমরা মূলত এই অনুরোধ করি, যদি তারা কখনো ক্ষমতা হাতে পান তাহলে তারা যেন প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন। ইসলামপন্থীদের হাতে যদি কোনো স্থানে কোনো সময় শাসনক্ষমতা চলে আসে তখন তাদের কাঁধে কত বিশাল বিশাল সব দায়িত্ব এসে পড়বে। বহিঃশত্রু ও দেশীয় সেক্যুলার-মুনাফিক চরদের প্রতিরোধ করা, ভেতরে গজিয়ে ওঠা ফিতনা ও দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করা, মজবুত ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিনির্মাণ, শরীয়াহবিরোধী চুক্তি বাতিল, সুদি কারবার বন্ধ ঘোষণা, সেনাবাহিনীকে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান করা ও তাদের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা, অস্ত্র তৈরি, সঠিক প্রস্তুতি, শরীয়াহ-কেন্দ্রিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ক্ষুধা দূরীকরণ, পর্যাপ্ত চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, ঘুষ, প্রতারণা ও গুদামজাতে বাধা প্রদান, বেকারদের কর্মসংস্থান, মদ ও নেশাজাতদ্রব্য ধ্বংসকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধকরণ, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ও গণমাধ্যমকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানো, অপরাধ দমন, ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন, নষ্ট শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত সম্পদ সমাজের হাতে ফেরত প্রদান, জনগণকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষাদানসহ আরও অনেক অনেক দায়িত্ব। এ সবগুলোই শরীয়াহ আইন প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ইসলামী রাষ্ট্র কি এক ধাপে কিংবা ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিনে এ সবকিছু একসাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে? অবশ্যই না। তাহলে তাদের কাছে আমাদের দাবি মূলত কী? সামনের পর্বে সেটিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

আমরা কি ইসলামপন্থীদের নিকট তাদের সামর্থ্যের বাইরে কিছু দাবি করছি?

গত পর্বে আমরা এমন তিন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছিলাম যারা ঘরে ফিরে এসে আগুন দেখতে পেয়েছিলেন। আমরা বলেছিলাম, ইসলামপন্থীদের কেউ যদি ক্ষমতা হাতে পান তার উচিত হবে উদাহরণে উল্লেখিত প্রথম ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা। অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পূর্বে অধিকতর বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা।

প্রথম ব্যক্তিটি যেভাবে সন্তানরক্ষার তাগিদে সম্পদরক্ষার মায়া ছেড়ে দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীদের অনেক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কিছু কর্তব্য

থেকে পিছু হটতে হয়, কর্তব্য পালনের স্বার্থেই কিছু কর্তব্য ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এর কারণে তাদেরকে কোনো নিন্দা বা তিরস্কার ইসলাম করেনি। আল্লাহ বলেন:

﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾

'আর সৎকর্মশীলদের ওপর অভিযোগের কোনো পথ নেই।'[৩২]

অন্য স্থানে বলেন:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

'তিনি এই দীনে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।'[৩৩]

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো সাধ্যানুযায়ী।'[৩৪]

আর আল্লাহর রাসূল ﷺ আহযাব যুদ্ধের পরে বলেছিলেন:

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

'আল্লাহ তাআলা কাফিরদের ঘরবাড়ি ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন। তারা আমাদের যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে আসরের নামাজ থেকে বঞ্চিত করেছে।'[৩৫]

আচ্ছা তাহলে ইসলামপন্থীদের নিকট আমাদের দাবি মূলত কী? আমরা তাদের কাছে কী চাই? আমরা চাই ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিনেই যেন তারা এই ঘোষণা দিয়ে দেন যে, হুকুম একমাত্র আল্লাহর। আর যে সমস্ত আইন শরীয়াহ আইনের বিপরীত তার সবগুলোই পায়ের তলায়। শর্তহীন পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব থাকবে শুধু শরীয়াহর হাতে, তার সমকক্ষ কর্তৃত্ব অন্য কারও থাকবে না। যদি তারা ফরয

৩২. সূরা তাওবাহ: ৯১।
৩৩. সূরা হজ্জ: ৭৮।
৩৪. সূরা তাগাবুন: ১৬।
৩৫. সহীহ বুখারী: ৬৩৯৬।

কোনো বিধান বাস্তবায়ন করতে অক্ষম হন তাহলে সক্ষমতা অর্জনের আগ পর্যন্ত সে বিধানের আবশ্যিকতা রহিত থাকবে।

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

'আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।'[৩৬]

যদি আইন-কানুন ইসলামী হয়, আর রাষ্ট্র যদ্দূর সম্ভব তা প্রয়োগ করে তাহলেই শরীয়াহ প্রয়োগ হয়ে যায়। এখন কেউ যদি বলেন: এটাই তো পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রয়োগ। আমরা বলব: না, পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রয়োগের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। অন্য একটি পর্বে বিষয়টি ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট করব।

এখন আসুন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পাদনের উদাহরণ আমরা দেখে নিই। এই উদাহরণগুলো দেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ সকলের নিকট 'প্রথম দিন থেকেই শরীয়াহর একক কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেওয়া'র বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক: ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিনেই ইসলামপন্থীদের নিকট হয়তো[৩৭] এই দাবি করা হবে না যে, দখলকৃত সমস্ত ইসলামী ভূখণ্ডগুলো এখনই মুক্ত করুন। কিন্তু ধরে নিন, কিছু যুবক এই ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করল তারপর দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ইসলামী রাষ্ট্রটির আশ্রয়ে ফিরে এল। রাষ্ট্র কি তখন তাদের জঙ্গিবাদ দমন আইনের আওতায় এনে অপরাধী সাব্যস্ত করবে? অবশ্যই না। জঙ্গিবাদ দমন আইন, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি[৩৮] কিংবা সে সমস্ত আইন বা চুক্তি, যা মুসলিমদের সাহায্য করা থেকে বাধা প্রদান করে সবগুলোই শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণার কারণে অকার্যকর হয়ে যাবে। আর এ সমস্ত আইনের স্থলে আল্লাহর দেওয়া এই আইন বহাল হবে,

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾

---

৩৬. সূরা বাকারা: ২৮৬।

৩৭. 'হয়তো' শব্দটি উল্লেখ করার একটি কারণ আছে। কারণটি কী? ১১ নং পর্বে উল্লেখ করা হবে।

৩৮. ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি হলো মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যকার শান্তিচুক্তি। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিডে প্রায় বারো দিনের গোপন আলোচনার মাধ্যমে এই চুক্তি তৈরি করেন। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় হোয়াইট হাউসে। এই চুক্তির জন্য সাদাত ও মেনাখেম যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

'আর তোমাদের কী হলো যে, তেমারা আল্লাহর রাহে দুর্বলদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছ না।'[৩৯]

এই আইন সাধ্যানুযায়ী প্রয়োগ করা এক বিষয়, আর এর বিরোধিতা করা ভিন্ন বিষয়।

এই অবস্থায় শাসকের উচিত হবে সে যুবকদের ডেকে কোমলতার সাথে বলা, "বৎস, এত তাড়াতাড়ি এমন কেন করতে গেলে? আমরা এখনো তো যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ, ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অভ্যন্তরীণ ফিতনা মোকাবিলায় ব্যস্ত। আমরা চাই তোমার এই দৃঢ়তা তুমি আপাতত এই কাজগুলোতেই ব্যয় করো। ওয়াল্লাহি! ইসলামী ভূখণ্ডগুলো মুক্ত না করার আগ পর্যন্ত আমরাও স্থির হব না। আমাদের এখন এমন অবস্থায় ফেলে দিয়ো না, যার শক্তি আমরা রাখি না।"

যদি তাদের কাজ নবগঠিত এই ইসলামী রাষ্ট্রকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয় তাহলে শাসক এই অতিউৎসাহী যুবকদের ধমক দেবে। কিন্তু যদি তাদের ওপর জঙ্গিবাদ দমন আইন নামের ইসলাম দমন আইন প্রয়োগ করে বসে তাহলে নামটি ছাড়া রাষ্ট্রের ইসলামী আর কীই-বা বাকি থাকল? ইসলামী ভূখণ্ডগুলো স্বাধীন করার সামর্থ্য রাষ্ট্রের না থাকতে পারে, কিন্তু সেই সাথে মুজাহিদদের দমন করার সামর্থ্যও যেন তাদের না থাকে।

দুই: যদি ইসলামপন্থীগণ এমন রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হন যেখানে বেশ্যালয়, মদ্যশালা, সিনেমা-হল, পুরুষ পরিচালিত লেডিস পার্লার, অশ্লীল ম্যাসাজ পার্লার, ভাস্কর্য প্রদর্শনী, অশ্লীল চটিবই কিংবা কুফরী বইয়ের ছড়াছড়ি, সে সমস্ত রাষ্ট্রে প্রথমদিনেই এতসব কিছু বন্ধ করার শক্তি নিশ্চয় তার থাকবে না। কিন্তু শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণার কারণেই এ সমস্ত বিষয়গুলোর বিধান সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী মানবরচিত সংবিধানে এমন অনেক আইন ছিল, যা এই কাজগুলোকে নিরাপত্তা দিত, আর যারা এগুলোর বিরোধিতা করত তাদের ওপর আইনের নামে রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়ন চালাত। কিন্তু এখন শুধু শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার কারণে এই স্থানগুলো নিষিদ্ধ স্থানে পরিণত হয়ে যাবে। এমনকি রাষ্ট্রের সক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তি কিংবা আইনের আশ্রয় আর তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

---

৩৯. সূরা নিসা: ৭৫।

তিন: রাষ্ট্রীয় মুনাফিক ও সেক্যুলারগণ শত্রুদেশগুলোর প্ররোচনায় অনেক সময় শরীয়াহ ও তার আহকাম নিয়ে বিদ্রুপ করার দুঃসাহস দেখাবে, এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ﷺ কটূক্তি করতেও তাদের বাধবে না। তখন হয়তো প্রথম দিনেই তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সামর্থ্য রাষ্ট্রের থাকবে না। কিন্তু শুধু শরীয়াহ বাস্তবায়ন করার ঘোষণার কারণেই তারা আল্লাহপ্রদত্ত ন্যায়বিচারের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে—যদি না তারা তওবা করে। আর রাষ্ট্র সামর্থ্যবান হওয়ার সাথে সাথেই তাদের বিচারের আওতায় আনবে। মুনাফিক ও সেক্যুলারদের বস্তাপচা চিন্তা ও তথাকথিত বাকস্বাধীনতা আগের মতো আর রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শক্তি সঞ্চয় করবে না। যে রাষ্ট্র এই স্বাধীনতা শুধু তাদেরই দিয়ে রেখেছিল, আল্লাহর পথের দায়ীদের দেয়নি।

আর নবগঠিত এই রাষ্ট্রে সেক্যুলারদের সুনির্দিষ্ট সীমায় থামিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। রাষ্ট্রটি হবে আল্লাহর সম্মান ও তাঁর দাসত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

চার: কিছু কিছু দেশে এমন অনেক মাজার ও ধর্মীয় স্থান আছে যেগুলোকে মানুষ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করে। এগুলোর সামনে তারা বিভিন্ন বিদয়াতি ও শিরকি কর্মকাণ্ড চালায়। পূর্বে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিত, তাদের বিভিন্ন সমস্যায় রক্ষকের ভূমিকা পালন করত। কিন্তু শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়ামাত্র এই মাজারগুলো সরিয়ে দেওয়া সময়ের ব্যাপারে পরিণত হবে। রাষ্ট্র এগুলো সরিয়ে দিতে সামর্থ্যবান হওয়ার সাথে সাথেই এগুলো সাধারণ কবরস্থানে পরিণত করবে। আগের মতো এগুলোর রক্ষক হয়ে থাকবে না।

পাঁচ: ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব হলো, চিকিৎসাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গুরুত্বারোপ করা। সেই সাথে কৃষি ও পশুপালন খাতে স্বনির্ভর হওয়া। কেননা, এই খাতগুলোতে যদি শত্রুর ওপর নির্ভর করতে হয় তাহলে সে এগুলোকে কাজে লাগিয়ে সহজেই লাঠি ঘুরাতে পারবে। চাপ সৃষ্টি করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইবে। এ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর অন্যান্য ভারী শিল্পতেও আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক, যাতে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অটুট থাকে। আর এ সমস্ত প্রকল্প শরীয়াহ বাস্তবায়ন করারই অংশ। কেননা, প্রাণরক্ষা, সম্পদরক্ষা, প্রজন্মরক্ষা এগুলো সবগুলোই মাকাসিদুশ শরীয়াহর[৪০] অন্তর্ভুক্ত।

---

৪০. মাকাসিদুশ শরীয়াহকে 'শরীয়াহর উদ্দেশ্য' বলা যায়। অর্থাৎ, শরীয়ত আমাদের জন্যে যে বিধিবিধানগুলো

এটা তো জানা কথা যে, এসব প্রকল্প ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিনেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, শত্রুর জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এমন-সব চুক্তিই এখন থেকে বাতিল।

ছয়: নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র তার মুখোমুখি এমন অনেক নষ্টদের দেখতে পাবে যারা পূর্বেকার জাহেলী অনৈসলামী রাষ্ট্র থেকে উপকৃত হতে পেরেছিল। এই দুর্নীতিবাজ লোকগুলো রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে আর নিজেদের লোক দ্বারা বিভিন্ন সেক্টর ভর্তি করে রাখে। এদেরই তৈরিকৃত ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণে জনগণ জর্জরিত হয়। নবগঠিত রাষ্ট্র হয়তো এই বিশেষ শ্রেণির হাতে লুণ্ঠিত সম্পদকে প্রথম দিনেই জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। তাই বলে এদের অন্যায় কাজে সহযোগিতাও করবে না। যেমন, তাদেরই কেউ এসে বলল: অমুক ব্যক্তি কয়েকবছর পূর্বে আমার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল। এখন সে টাকা সুদ-সমেত জমতে জমতে বিশাল অঙ্ক ধারণ করেছে। এখন সে শুধু মূলধনগুলো ফেরত দিয়েছে, বাড়তি মুনাফার টাকাগুলো দিচ্ছে না কিংবা এর বিনিময়ে তার বাড়িটি আমাকে বন্ধক দিচ্ছে না। এখন রাষ্ট্র কি তাকে তার এই হারাম ও অন্যায় কাজে সাহায্য করবে? কক্ষনোই না। কারণ, শরীয়াহ প্রয়োগ করার ঘোষণা দেওয়ার কারণে লোকটির মুনাফা নিষিদ্ধ সুদে পরিণত হয়েছে।

এই উদাহরণগুলোর ওপর ভিত্তি করে আরও অনেক বিষয় তুলনা করতে পারেন।

আচ্ছা এবার বলুন! যারা ক্ষমতায় আরোহণ করবে আমরা কি তাদের নিকট সামর্থ্যের বাইরে কিছু দাবি করে ফেলেছি? ওয়াল্লাহি, না। কেননা, সহজভাবে বললে, হয়তো ইসলাম নাহয় অনৈসলাম, হয়তো শরীয়াহ নাহয় মানবরচিত আইন। ওপরে বর্ণিত উদাহরণগুলো থেকে অনেক শিক্ষা আমরা বের করতে পারি। কী সে শিক্ষা? সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করব।

প্রণয়ন করেছে এসবের পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য কী? বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ শরীয়তপ্রণেতা আসলে কী চান? এসব প্রশ্নের উত্তরে যা আসে তা-ই হলো মাকাসিদুশ শরীয়াহ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন ইমাম গাজ্জালি, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি ﵀-সহ আরও অনেকে।

প্রথম থেকেই শরীয়াহ্ শাসনের ঘোষণা দেওয়া কেন জরুরি?

আমরা গত পর্বে বর্ণনা করেছি, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন যদি তারা ক্ষমতায় আরোহণের সুযোগ পান তাহলে শুরু থেকেই তাদের শরীয়াহকে একক ও নিঃশর্তভাবে পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী বলে ঘোষণা দিতে হবে। আমরা এও বলেছি, শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়া মানে এক দফায় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কিংবা সমস্ত মন্দের উৎপাটন করা নয়; বরং যদি আইন সম্পূর্ণভাবে ইসলামী হয় আর রাষ্ট্র তা যথাসম্ভব প্রয়োগ করে তাহলেই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। গত পর্বে আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দেখেছি, শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা কতকিছুতেই বড়সড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। সে উদাহরণগুলো থেকে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা পর্যালোচনা করার কথা ছিল। আসুন! সে শিক্ষাগুলো এখন আমরা পর্যালোচনা করি।

এক: আমরা লক্ষ করেছি, শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা সমাজের প্রতিটি খাতে কীভাবে প্রভাব সৃষ্টি করছে। শুধু এই ঘোষণার কারণে সমাজের ভিত্তি আল্লাহর শর্তহীন দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। মানবরচিত আইনে অপরাধ সাব্যস্ত হয় এমন অনেক কর্মকাণ্ড শরীয়াহর ছায়াতলে বৈধ হচ্ছে। যা আগে বৈধ ছিল এখন তা অপরাধে পরিণত হচ্ছে। অনেকেই মর্যাদা হারাচ্ছেন, কেউ-বা অর্জন করছেন। আগের আইনে অনেকেই লাভবান্বিত ছিলেন, এখন শরীয়াহ তাদের ক্ষতিতে ফেলছেন, আবার এর বিপরীতও ঘটেছে। অনেক চুক্তি বাতিল হচ্ছে, অনেকগুলো আবার দৃঢ় হচ্ছে। সবগুলোই ঘটছে শুরু থেকে শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা দেওয়ার কারণে।

রাষ্ট্র যদিও-বা সমস্ত ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম না হয় তবুও শরীয়াহ নামটির একটি বড় প্রভাব রয়েছে। কেউ কোনো কাজ করার পর রাষ্ট্র তার এই কাজ সমর্থন করল আর কেউ কোনো কাজ করার পর রাষ্ট্র একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করল—ত্বরিত শাস্তি দিতে না পারলেও—এই দুটি অবস্থার মাঝে নিশ্চয় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাই সমাজের আচার-ব্যবস্থায় এই সংজ্ঞায়নের প্রভাব অনেক গভীর।

দুই: আমরা এও লক্ষ করেছি যে, শুরু থেকেই শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা না দেওয়ার অর্থ হলো ইসলামী রাষ্ট্রকে মানবরচিত জাহেলী সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত করার নামান্তর।

আমরা যখন বলি, ইসলামপন্থীগণ ক্ষমতায় আরোহণ করে রাষ্ট্র গঠন করেছেন। তখন তাদের কাজকর্ম, তাদের নেতৃবর্গ ও আচরণ নিরপেক্ষ হতে পারবে না। হয়তো তারা ইসলামের মাধ্যমে শাসন করবে নয়তো মানবরচিত জাহেলী সংবিধানের মাধ্যমে।

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

'তারা কি জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম শাসনকারী কে হতে পারে?'[৪১]

এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বুঝতে এই সিরিজের তৃতীয় পর্ব পুনর্পাঠ করা যেতে পারে।

আপনারা যারা প্রথম থেকেই শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন, জেনে রাখুন, আপনাদের এই আহ্বানের কারণে একটি ইসলামী রাষ্ট্র মানবরচিত আইনের অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হচ্ছে, সে আইনগুলোকে বাস্তবায়ন করছে, যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের ধরপাকড় করছে। পাপীদের ধরে ধরে পুরস্কৃত করছে আর বিশ্বাসীদের শাস্তি দিচ্ছে। এমন হলে, রাষ্ট্রের ইসলামী নাম বাদে আর কীই-বা বাকি থাকল?

এক দায়ীর বক্তব্য শুনে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। তিনি মসজিদে বলছিলেন: "এমনটা ধারণা করবেন না যে, ইসলামপন্থীগণ যদি ক্ষমতায় আরোহণ করে তারা প্রথমবারেই সবকিছু পাল্টে ফেলবে। হতে পারে প্রথম দুই থেকে তিন বছর কোনো আইনই পাল্টানো হবে না।"

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারাই বুঝতে পারছেন কতটা ভয়ংকর এই বক্তব্য। যেন অজান্তেই মানবরচিত জাহেলী আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার বৈধতা ঘোষণা করা হচ্ছে। যদি কোনো আইনই পরিবর্তন করা না হয় তাহলে সরাসরি হারাম

---

৪১. সূরা মায়েদা: ৫০।

আইনগুলো আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। রাষ্ট্র এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা এই আইনগুলোর বিরোধিতা করবে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। ভাবা যায়! শেষ পর্যন্ত একটি ইসলামী রাষ্ট্র জাহেলী আইনের অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হয়ে থাকবে!

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

'তোমাদের কী হলো? এ তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত?'[৪২]

এরপরও আপনারা যারা পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ বাস্তবায়নের দিকে আহ্বান করছেন, কখনো কি ভেবে দেখেছেন কোন পথে মানুষকে ডাকছেন?

তিন: হক পথ শুধু একটিই, কিন্তু বাতিল পথ অসংখ্য। যদি দায়ীগণ প্রথম থেকেই শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা দিয়ে না দেন তাহলে তারা বিকল্প পথে ভেসে যাবেন। কারণ, হকের পথে ছাড় দেওয়ার কারণে তারা উদ্দেশ্য হারিয়ে বসবেন।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

'আর সত্যের পরে গোমরাহী ছাড়া আর কীই-বা রয়েছে? সুতরাং তোমরা কোথায় ঘুরছ?'[৪৩]

তখন আপনি দেখবেন অমুক দায়ী বলছে: আমরা প্রথম দুই-তিন বছর কোনো আইনই পাল্টাব না। আবার দেখবেন অন্য একজন সময়টা কমিয়ে কয়েক মাসে নিয়ে আসছে। কেউ বাড়াচ্ছে কেউ কমাচ্ছে। কেউ-বা বলছে: প্রথমে ইসলামী সে আইনগুলোই প্রয়োগ করা হবে যা জনগণ গ্রহণ করে নেবেন। তারপর শেষে তারা যা মেনে নেবে না তাও প্রয়োগ করা হবে। আবার অন্য কাউকে বলতে শুনবেন: প্রথমে চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কিত শরীয়াহ আইনগুলোই প্রয়োগ করা হবে, পরবর্তী সময়ে দণ্ডবিধি-সংক্রান্ত আইন। আবার কেউ বলবে: প্রথমে অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা হবে, তারপর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা হবে। তখন দেখবেন, শরীয়াহ জনগণের ইচ্ছার আওতাধীন বিষয়ে পরিণত হবে। যমীনে শরীয়াহ ও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর দাসত্বের যে অর্থ তা গৌণ হয়ে মানব-প্রবৃত্তি, অনুমান ও ধারণার কাছে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

---

৪২. সূরা সফফাত: ১৫৪।

৪৩. সূরা ইউনুস: ৩২।

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

'বস্তুত তাদের অধিকাংশ শুধুই ধারণার ওপর চলে, অথচ ধারণা-অনুমান হকের বেলায় কোনো কাজেই আসে না।'[৪৪]

এটি কি কখনো যুক্তিযুক্ত কথা যে! শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার মতো চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আল্লাহ মানুষের ধারণার ওপর ছেড়ে দেবেন?

অতএব স্পষ্ট কথা, হকের পথ মাত্র একটিই। আর সেটি হলো, প্রথম থেকেই নিঃশর্তভাবে পরিপূর্ণ শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা দেওয়ার মধ্যে। যে এই পথ ছেড়ে দেবে সে অনেক ডালপালায় জড়িয়ে পড়বে। বাতিলের গোলকধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

চার: প্রথম থেকেই শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা শাসক ও জনগণকে এমন এক সুতায় বেঁধে ফেলবে, যার কারণে কোনো পক্ষই আর প্রতারণার সুযোগ পাবে না। শাসক যতই নিরাপত্তা বলয় তৈরি করুক-না কেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে তাকে আটকে ফেলা যাবে। সে যদি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তা পূরণ করতে গড়িমসি করে তাহলে জনগণ তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতে পারবে। শরীয়াহ নামক এই স্পষ্ট মাপকাঠির মাধ্যমে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড যাচাই করতে সক্ষম হবে। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মী তারাও নিশ্চয় নিষ্পাপ নন। তারা শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর ক্ষমতার কালিমা ও আড়ম্বরতায় যে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তারাও তো পূর্ববর্তীদের পথ ধরতে পারেন। এমনকি ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই তাদের অনেকের বিপর্যয় আমরা এখন স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

তাই প্রথম থেকেই শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা দেওয়ার পরিবর্তে এখন যে মরীচিকাময় সুন্দর সুন্দর বক্তব্যগুলোর প্রচলন করা হয়েছে, আমরা তা গ্রহণ করব না। প্রচলিত সে স্লোগানগুলো এমন, "ধীরে ধীরে শরীয়াহ প্রয়োগের সুস্পষ্ট এজেন্ডা রয়েছে আমাদের হাতে", "আমরা শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আইন প্রণয়ন করব", "অমুকের শরীয়াহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে", "অমুক দল শরীয়াহ

৪৪. সূরা ইউনুস: ৩৬।

প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ হাতে নিয়ে থাকতে পারে", "অমুকের শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্প থাকতে পারে", "অমুক শরীয়াহর প্রতি আন্তরিক", "রাষ্ট্র অচিরেই শরীয়াহ-প্রধান দেশ হবে"।

এগুলো সব হেঁয়ালিপূর্ণ পলায়নপর বক্তব্য।

আমার ভাইয়েরা, শরীয়াহ বাস্তবায়ন হলো একটি চুক্তি। আপনি বাড়ির মালিকের কাছে বাসা ভাড়া নেওয়ার পর তো চুক্তিপত্রে এটি লেখবেন না যে, উভয় পক্ষ এই বিষয়ের ওপর সম্মত হয়েছে যে, ভাড়াটিয়া মাসে পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করবে, বিপরীতে বাড়ির মালিকের বাসা ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে!" বিয়ের কাবিননামায় যদি এমনটা লেখা থাকে আপনি কি মেনে নেবেন, "উভয়পক্ষ মোহরের ব্যাপারে একমত হয়েছে বিপরীতে মেয়ের বাবার এই বিয়েতে সম্মতি থাকতে হবে!" তখন শুধু ইচ্ছা কিংবা সম্মতিই কি আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে? ঠিক একইভাবে, শরীয়াহ হলো শাসক ও জনগণের মধ্যকার চুক্তি। জনগণ এই শাসকের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করছে, এর বিপরীতে শাসক শরীয়াহ দ্বারা শাসন করছে। এর সাথে সাথে এটি মহান আল্লাহর সাথেও সম্পাদিত একটি চুক্তি। দাসত্বের ও তার শরীয়াহর প্রতি আনুগত্যের চুক্তি। অন্যান্য চুক্তির ন্যায় এই চুক্তিতেও মিষ্টি মিষ্টি কথা চলবে না। যদি আপনি ভাড়া ও বিয়ের চুক্তিতে হেঁয়ালিপূর্ণ এই বাক্যগুলো মেনে না নেন তাহলে খোদ আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে কীভাবে এই বাক্যগুলো মেনে নেন?

'শরীয়াহ প্রয়োগ' বাক্যটি শৃঙ্খলাবদ্ধ, একে পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু 'পরিকল্পনা, পর্যায়ক্রম, নিয়ত, ভিশন, শরীয়াহ-ভিত্তিক, আন্তরিক' এই ধরনের শব্দগুলোর কোনো নির্ধারিত অর্থ নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন অর্থ তোলা সম্ভব। এই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করে কেউ যদি কখনো সরকার গঠন করে, এরপর যদি কুরসির লোভ তাকে পেয়ে বসে, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে যদি সে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পশ্চিমের চাটুকারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন জনগণ কিসের ভিত্তিতে তাদের জবাবদিহি করবে?

যখন শরীয়াহর কোনো আইন নিয়ে তারা গড়িমসি করবেন তখন যদি কেউ তাদের শরীয়াহ বাস্তবায়নের চাপ দেন তাহলে তথাকথিত ইসলামপন্থীগণ বলে উঠবেন, "শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে আমাদের ভালো নিয়ত ও সঠিক পরিকল্পনা রয়েছে।

কিন্তু আমরা মনে করি এখনো জনগণ যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে উঠেননি। তাই এই অবস্থায় শরীয়াহ প্রয়োগ করা উপযুক্ত হবে না; বরঞ্চ আমরা এই শাখাগত বিষয়ে শরীয়াহ প্রয়োগ না করার মাঝেই কল্যাণ দেখি। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডাকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তাই সে অনুযায়ী কিছুকাল এভাবেই চলবে।"

যদি ইসলামপন্থী শাসকেরা এভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়েন, যদি তারা নিজেদের খোলস বদলে ফেলেন তখন তাদের বাধা দেওয়ার উপায় আর কী বাকি থাকবে? বিশেষ করে, যদি শুরু থেকেই তারা এই ধরনের হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য দিয়ে জনগণকে বুঝ দিয়ে আসেন তাহলে তো আর কথাই নেই। তখন অতীতে তাদের এই কথাগুলোর আসলেই কী উদ্দেশ্য ছিল সেটি নিয়ে নতুন যুদ্ধ শুরু হবে।

এটি গেল গত পর্বে বর্ণনা করা উদাহরণগুলো থেকে নেওয়া চতুর্থ শিক্ষা। আরও অনেক শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে আর এগুলাম না।

আচ্ছা এই চারটি শিক্ষা তাহলে আবার সংক্ষেপে দেখে নিই:

> এক. প্রথম থেকেই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা অনেক কিছু নির্ধারণে, বুঝতে ও সামাজিক নিয়ম-কানুনে বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।
>
> দুই. প্রথম থেকেই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা না দেওয়া, রাষ্ট্রকে মানবরচিত জাহেলী আইনে পরিচালিত করার নামান্তর!
>
> তিন. প্রথম থেকেই শরীয়াহ আইনের ঘোষণা দেওয়া না হলে বাতিলের বিছানো অসংখ্য চোরাবালিতে হারিয়ে যেতে হবে।
>
> চার. শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা এমন একটি চুক্তি, যার মধ্যে অস্পষ্ট ও হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য চলে না।

এই পর্বের সারকথা হলো: প্রথম দিন থেকেই শরীয়াহ শাসনের ঘোষণা দেওয়া হলো একমাত্র সঠিক পথ। শরীয়াহর নির্ধারিত, সুশৃঙ্খল ও বিন্যস্ত অর্থ একমাত্র এর মাধ্যমেই বুঝে আসে। এর মাধ্যমেই একমাত্র শাসক ও জনগণকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পথ জাহেলী শাসন ও বাতিলের বিছিয়ে দেওয়া চোরাবালিতে ঢাকা। আর অনির্ধারিত ও অস্পষ্ট কিছু স্লোগান শাসক ও জনগকে বিচ্যুতির পথে নিয়ে যায়।

একটি মহান লক্ষ্য
জনগণের মাঝে বাঁধভাঙা শক্তির সঞ্চার করে

নবম পর্বে আমি আপনাদের একটি কথা বলেছিলাম: ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিনেই ইসলামপন্থীদের নিকট 'হয়তো' এই দাবি করা হবে না যে, দখলকৃত সমস্ত ইসলামী ভূখণ্ডগুলো এখনই মুক্ত করুন। 'হয়তো' কেন বলেছিলাম শুনুন।

যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আল আইউবি ﷺ মিসরের ক্ষমতায় আরোহণ করছিলেন তখন সেখানের অবস্থা খুব বেশি সংকটাপন্ন ছিল, অনেকটা বর্তমান সময়ের মতো। দুই শ বছর উবায়দিয়্যাহ ফাতেমি[৪৫] সাম্রাজ্যের অধীনে এটি তখন পিষ্ট। এই সাম্রাজ্যের সাথে অবশ্য ইসলামের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এদের কারণে মিসরে আহলুস সুন্নাহর আকীদা প্রায় বিলুপ্ত। চারিদিকে পাপাচার আর অশ্লীলতা। অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলোও ক্রুসেড যুদ্ধে জর্জরিত। আইউবি ক্ষমতায় আরোহণের পর ক্রুসেডাররা মিসরে আক্রমণ চালাল। সে সময় সুলতাম সালাহুদ্দিন আইউবি কী করেছিলেন? তিনি কি ক্রুসেডারদের চাটুকারিতা করেছিলেন? বলেছিলেন, যেহেতু মিসরবাসী আকীদা ভুলে গিয়েছে আমি ধীরেসুস্থে পর্যায়ক্রমে তাদের দীন শেখাব? না। বরং তিনি জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মিসরবাসীর সামনে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন: আমাদের কুদস ও অন্যান্য দখলকৃত মুসলিমভূমি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী ﷺ[৪৬] আল আকসায় স্থাপন করতে একটি মিম্বার নির্মাণ করলেন। মিসরবাসীর নিকট একটি মহান লক্ষ্য তৈরি হলো; মিম্বারটি আল আকসায় স্থাপন করতেই হবে।

---

৪৫. ফাতেমী সাম্রাজ্য ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাসে একমাত্র শিয়া সাম্রাজ্য। ৯০৯ থেকে ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের শাসনক্ষমতা। ইমাম মাহদীর নামে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে তাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তী সময়ে পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মিসর, শাম ও হিজায পর্যন্ত তাদের শাসনক্ষমতা বিস্তৃত হয়। তাদের এই শাসনকাল উম্মাহর ইতিহাসের ঘনকালো এক অধ্যায়। বিস্তারিত জানতে পড়ুন ড. আলী সাল্লাবী রচিত 'ফাতেমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস' বইটি।

৪৬. সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী (১১১৮-১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন হালবের সুলতান। দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের অগ্রনায়ক। শামকে শিয়াদের ফাতেমী সাম্রাজ্য থেকে বের করে তিনি আব্বাসী সাম্রাজ্যের অধীন করেছিলেন। তিনিই সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্যে তৈরি করে দিয়েছিলেন কুদস পুনরুদ্ধারের পথ। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন ড. আলী সাল্লাবি রচিত 'আল কাইদুল মুজাহিদ নুরুদ্দীন জিংকি' বইটি।

দু শ বছর মুনাফিক ফাতেমিদের শাসনে ক্ষুধায় নিপীড়িত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মিসরবাসীর সামনে যখন একটি মহান উদ্দেশ্য স্থাপন করা হলো তারাও মহান জাতিতে পরিণত হলেন। তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা, সাহস ও মনোবল সবকিছুই আকাশচুম্বী হয়ে গেল। ফাতেমি শাসনের প্রভাব মুহূর্তেই ধুলোয় মিশে গেল। তারপর কুদসের মুক্তি তাদের হাতে ধরেই এল। হিত্তিনের অধিকাংশ যোদ্ধা ছিলেন মিসরীয়।

যুগে যুগে যত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে সবার জন্যে এই ঘটনাটি একটি শিক্ষা: জনগণের সামনে একটি মহান লক্ষ্য স্থাপন কর, দেখবে সব ছোট সমস্যা ধুলোয় মিশে যাবে।

বর্তমানে বহুল প্রচলিত স্লোগান হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের উচিত আগে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করা। কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার আগে মানুষদের ধীরে-সুস্থে হারাম থেকে সরিয়ে আনা। অথচ ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় এর উল্টোটা। একটি মহান লক্ষ্য মানুষদের উদ্দীপ্ত করে তোলে, জনগণের মাঝে বাঁধভাঙা শক্তির সঞ্চার করে।

হযরত আবু বকর ﵁ রাসুলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর যখন বিভিন্ন গোত্র মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল তখন মক্কা, মদীনা ও তায়েফের লোকদের সামনে একটি মহান লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন। অথচ সেখানে এমন নওমুসলিমও ছিলেন, যারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন দুই থেকে তিন বছরও অতিবাহিত হয়নি। তিনি নবীজির আদেশে পালনার্থে হযরত উসামার ﵁ নেতৃত্বে রোমের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠালেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাকে বলেছিলেন:

يا أبا بكر رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟

“আবু বকর, তাদের ফিরিয়ে আনুন। তারা রোমের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে অথচ মদীনার আশপাশের সমস্ত গোত্র মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে।”

তখন আবু বকর ﵁ জবাব দিয়েছিলেন:

والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله.

সে মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! যদি কুকুরেরা রাসূলের স্ত্রীদের পা কামড়ে টেনে নিয়ে যায় তবুও আমি সে বাহিনীকে ফিরিয়ে আনব না, যাকে পাঠিয়েছেন খোদ আল্লাহর রাসূল। আমি সে পতাকা খুলে নেব না যাকে আল্লাহর রাসূল স্বয়ং স্থাপন করেছেন।"[৪৭]

তো হযরত উসামা ﷺ রোমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যখন এমন গোত্র অতিক্রম করতেন, যারা মুরতাদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, তখন এই গোত্রগুলো হযরত উসামার সৈন্যবহর দেখে ভয় পেয়ে যেত। বলত; মুসলিমদের যদি কোনো শক্তি না থাকত তাহলে তারা এই কঠিন সময়টাতে সৈন্য পাঠাত না। আমরা বরঞ্চ যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করি। দেখি কী হয়। দেখা গেল মুসলিম বাহিনী রোমানদের পরাজিত করে নিরাপদে ফিরে এল। এই দৃশ্য দেখে যারা মুরতাদ হওয়ার চিন্তায় বিভোর ছিল তারা ইসলামের ওপর অটল রইল।

এখানে মহান উদ্দেশ্যটি ছিল: আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিঃশর্ত আনুগত্য। সাধারণ চিন্তায় এটি তেমন কোনো যৌক্তিক ও বাস্তবিক লক্ষ্য না হলেও এটিই বাঁধভাঙা শক্তির সঞ্চার করেছিল।

কল্পনা করুন, উদাহরণস্বরূপ মিসরে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা হলো। শাসকেরা কিছু স্লোগান নির্ধারণ করলেন। যেমন, মিসর উম্মাহর আশা, অথবা উম্মাহর মুক্তি আমাদের হাতেই, অথবা আল্লাহ ব্যতীত কারও সামনে আমরা নত হব না, অথবা রাসূলের খিলাফাহ আমরাই ফিরিয়ে আনব। একটি অপার্থিব মহান স্লোগান, যা উম্মাহর বর্তমান অবস্থার অনেক ঊর্ধ্বে। মিসর কিংবা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে এর কতটা প্রভাব সৃষ্টি হবে ভাবতে পারছেন?

ভাবা যায়! সে সময় মিসরবাসীর কেউ শাসকদের নিকট চিত্রশিল্পী বা গায়কদের স্বাধীনতা খুঁজবে? বেপর্দা নারী সে সময় পোশাকের স্বাধীনতা চাইবে? পর্যটনখাত, সমুদ্রতীর এবং এ থেকে রাজস্ব আয়ের বিষয়টি কি আবার উত্থাপন করার কেউ সাহস পাবে? সে সময় কি ইসলামের সমালোচনায় বাকস্বাধীনতার আবেদন জানানো হবে? বরং শুধু একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রাখার কারণে জনগণ এই তুচ্ছ ও নিচু বিষয়গুলো বেমালুম ভুলে যাবে। তারা নিজেরাই জবাব দেবে, তুমি এমন একটি দেশে পশ্চিমা পোশাক পরার স্বাধীনতা চাচ্ছ, যে দেশ নতুন করে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী!

---

৪৭. আল ই'তিকাদ লিল ইমাম আল বায়হাকী: ৫৮৫। দারুল ফদীলাহ।

যারা বিভিন্ন ভিত্তিহীন ও অমূলক দাবি তুলবে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কারণ, তারা নিম্নমানের দাবি তুলছে এমন জাতির সামনে, যারা মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। তখন জনগণই বরং তাদের বিতাড়ন করতে সরকারের নিকট জোর আবেদন জানাবে। তারাই এদের উম্মাহর শত্রু ও দেশবিরোধীদের চর আখ্যা দেবে। কেননা, এই লোকগুলো তাদের দাবির মাধ্যমে যেন উম্মাহর জিহাদি প্রাণশক্তিকে হেয়-প্রতিপন্ন করছে ও যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করছে। শত্রুই তো এসব চায়। তখন সেক্যুলার, মুনাফিক ও লিবারেলদের আর কোনো উপায় বাকি থাকবে না। তাদের হয়তো সে মহান লক্ষ্যকে কাছে টেনে নিতে হবে, নাহয় মুখে কুলুপ আঁটতে হবে। কেননা, তাদের যেকোনো আবেদনই জনগণ ছুড়ে মারছে।

মুনাফিকেরা কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ যুগে এই দাবিগুলো উত্থাপন করত? এমন কোনো নজীর কি আছে? কক্ষনোই না। কেননা, তৎকালীন জিহাদি সমাজ যারা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যস্ত তারা এদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করত।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো: যখন কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নিজেদের জন্যে একটি মহান লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন তখন পূর্বের তুচ্ছ ও হারাম লক্ষ্য জনগণের চোখে পথের কাঁটায় পরিণত হবে। কেননা, আগের সে নিম্নমানের উদ্দেশ্য এখনকার মহান উদ্দেশ্য পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তখন জনগণকে অবৈধ মেলামেশা, বেপর্দা, গান, ধূমপান, পশ্চিমা পোশাক, অবৈধ উপন্যাস থেকে শুরু করে সমস্ত হারাম কাজ থেকে বিরত রাখতে রাষ্ট্রের আর শক্তি ক্ষয় করতে হবে না। এসব একদফায় বন্ধ করতে গিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়ার ভয় আর থাকবে না; বরং মুসলিমরা নিজেরাই যখন এগুলোকে তাদের মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখবে তারা নিজেরাই এগুলো পদদলিত করে আপন লক্ষ্যপানে ছুটবে। অথচ অতীতে একসময় এগুলোই ছিল জনগণের উদ্দেশ্য, যখন তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা ও লক্ষ্য নিম্নমানের ছিল। কিন্তু যখন তাদের লক্ষ্য মহান ও উঁচু হলো এই বিষয়গুলো প্রতিবন্ধকতায় রূপান্তরিত হলো। তখন জনগণ এসব থেকে নিষ্কৃতি পেতে কোনো বাধাই মানবে না; বরং এতদিন এসবে ডুবে ছিল ভেবে নিজেকেই তিরস্কার করবে। রাষ্ট্র যদি জনগণকে হকের পথে উৎসাহিত না করে তাহলে জাতি বাতিলের পথে মনোনিবেশ করে।

আমার ভাইয়েরা, এই কথাগুলো কাল্পনিক কোনো ভাবনা মনে করবেন না; বরং আপনারা নিজেরাই লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, এমনকি একটি কাফের রাষ্ট্রও তার সামনে যখন বাতিল লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাদের মাঝে বাঁধভাঙা শক্তির সঞ্চার হয়। এর উদাহরণ ভূরিভূরি। যখন সমাজতান্ত্রিক নেতৃবর্গ রাশান জাতির সামনে শ্রেণিপ্রথা বিলুপ্তির লক্ষ্য স্থাপন করেছিল, তারা পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। অথচ এই জাতি কাফির ছিল, বিশ্লেষণ করলে তাদের লক্ষ্যও বাতিল ছিল।

একইভাবে যদি কখনো অযোগ্য নেতৃবর্গের পক্ষ থেকেও বড় কোনো স্লোগান আসে মুসলিম জনগণের মাঝে তারও গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। যখন মিসরে 'যুদ্ধই একমাত্র সমাধান' স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, তখন নিশ্চয় দেখেছেন নিম্নমানের জাতীয়তাবাদ, ধোঁকা ও বাতিলের হম্বিতম্বিতে জর্জরিত মিসর কীভাবে দুলে উঠেছিল। ভেবে দেখুন, সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রে যদি সত্যিকারার্থে এমন স্লোগান তোলা হয়, কী অবস্থার সৃষ্টি হবে।

ধরুন, জনগণের চোখের সামনে লক্ষ্য স্থাপন করা হলো। পথে পথে শত্রুরা অবস্থান করছে, মুখোশ সরে গিয়ে তাদের বীভৎস চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। জনগণ বিভিন্নভাবে কোরবানিও দিতে শুরু করেছে। সে সময় তাদের মাঝে রুখে দাঁড়ানো ও দৃঢ়তার প্রত্যয় সৃষ্টি হবে। যেকোনো প্রকারেই হোক, শত্রুকে বাঁধা দেওয়া সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে।

সে সমস্ত দেশগুলোর দিকে লক্ষ করুন যেগুলোতে ইসলামী সংগঠন ক্ষমতায় আরোহণ করেছে—তাদের পদ্ধতি শুদ্ধ কী শুদ্ধ নয় সেটা ভিন্ন আলাপ—গাজ্জা, আফগানিস্তান, সোমালিয়ার দিকে লক্ষ করুন। তাদের পরস্পরের পদ্ধতি ভিন্ন হলেও সাধারণ পরিভাষায় এদের ইসলামীই বলা হয়। তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়া উঠেপড়ে লেগেছিল। অবরোধ আরোপ, লাগাতার বোমা হামলা, বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার থেকে শুরু করে গোয়েন্দাগিরি পর্যন্ত, কী করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে? এতকিছু সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রগুলো তাদের তুলে ধরা স্লোগানের ওপর অটল হয়ে আছে।

এই জাতিগুলোর সামনে দুটি পথ খোলা রাখা হয়েছিল। যদি শান্তি, সমর্থন ও জীবনের মায়া থাকে তাহলে ইসলামী সরকারের পতন ঘটাও, নতুবা ক্ষুধা, বঞ্চনা ও অনিরাপদ জীবনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। এ সময় তাদের মধ্যে রুখে দাঁড়ানোর

প্রাণশক্তি জ্বলে উঠেছিল, তারা তাদের ইসলামপন্থী নেতৃবর্গের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেরই পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু দেখার বিষয় হলো, জনগণ বুঝতে পেরেছিল ধর্মের কারণেই তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলো ক্ষুধা, দরিদ্রতা ও গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও রুখে দাঁড়ানোর এই লক্ষ্য তাদের মাঝে বাঁধভাঙা শক্তির সঞ্চার করেছিল।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন: "নিজের জন্যে আকাশচুম্বী অবাস্তবিক একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করো। তারপর সংকল্পে ধার দাও। কেননা, জাতির নেতৃত্ব তারাই দিতে পারে, যাদের এমন লক্ষ্য থাকবে যা অন্যদের চোখে অসম্ভব। যা মানবীয় যুক্তিতে অবোধগম্য। কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় অনেক আশ্চর্যজনক কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়।"

যদি খোদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীগণই এটি মনে করেন যে, ইসলামের অত ক্ষমতা নেই। তাহলে তারা কখনোই এই জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। আল্লাহ তাদের কখনো নেতৃত্বের সুযোগ দেবেন না। ইসলামের মহান রূপ আগে নিজের অন্তরে ধারণ করতে হবে, জাতির অন্তরে তা সৃষ্টি করার আগে। কেননা, নিজের মাঝেই যা নেই তা অন্যদের কীভাবে দেবেন?

আগে দেওয়া তিন ব্যক্তির উদাহরণের মধ্যে এটি প্রথম ব্যক্তির কর্মকাণ্ড থেকে পাওয়া শিক্ষা। এই প্রথম ব্যক্তিটির একটি বড় লক্ষ্য ছিল। সে স্ত্রী ও সন্তানদের আগুন থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা করেছিল, সাথে সাথে তার শত্রুদের সাথে লড়তেও। সে এর ঘোষণা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থান কেমন ছিল? আগামী পর্বে সেটিই আমরা জানব।

এই পর্বের সারকথা হলো, যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক-না কেন সেখানেই জনগণের সামনে একটি মহান লক্ষ্য স্থাপন করতে হবে। এটিই হবে জনগণের শক্তিকে একত্র করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাদের গড়ে তোলা, বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি, তাদের মন্দ অভ্যাস থেকে সরিয়ে রাখা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের এই লক্ষ্যের ওপর একত্র করা যাবে।

সফলতার উপায় অবলম্বন

আমরা এখনো তিন ব্যক্তির ঘটনায় এগিয়ে চলছি। গত পর্বে প্রথম ব্যক্তির অবস্থান নিয়ে কিছু পর্যালোচনা করেছি। এখন আলোচনা হবে দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে।

ঘরকে আগুনে জ্বলতে দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্মকাণ্ড কেমন ছিল, আপনাদের তা আবার স্মরণ করিয়ে দিই। সে কোষাগারের দিকে ধাবিত আগুন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওদিকে তার স্ত্রী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ও সন্তানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ছিল। সে তাদের এই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে দুই রাকাত নফল নামাজে মনোযোগ দিল। লম্বা লম্বা সিজদা করল। দোয়া করল, আল্লাহ যেন অলৌকিকভাবে এই আগুন নিভিয়ে দেয়।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ দ্বারা আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় আসলে কী বোঝানো উদ্দেশ্য?

সাধারণভাবে বললে উদ্দেশ্য হলো, শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা যথেষ্ট হবে না; বরং তা কাজেও পরিণত করতে হবে। হ্যাঁ, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত আমরা তাদের নিকট এই দাবি করেছিলাম যেন তারা প্রথম থেকেই শরীয়াহ আইন প্রয়োগের ঘোষণা দেন। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট কথা যে, শুধু শরীয়াহ আইনের ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট নয়।

এই প্রতীকী কথাটি থেকে কয়েকটি উদাহরণ আমরা বের করতে পারি, যা নিচে দেওয়া হলো:

প্রথম উদাহরণ: "মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করা ছাড়া শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়া।" কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের এটি ভাবা মোটেও উচিত হবে না যে, উত্তম রাজনীতি, উদ্দীপনা, তৎপরতা, রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা, উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্ধারিত খাতে দায়িত্বদান, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ খাতে সঠিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য-বাসস্থান-চিকিৎসা-কর্মসংস্থানসহ মানুষের অন্যান্য সব চাহিদা পূরণে কঠিন পরিশ্রম করা ব্যতীত শরীয়াহকে আঁকড়ে ধরলেই তারা সফল হয়ে যাবেন। এমনিতেই আল্লাহর সাহায্য আসা শুরু হবে। যদি সামর্থ্য থাকার পরও রাষ্ট্র এসব কিছু পূরণে অবহেলা করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা মোটেও তার শোভা পায় না।

উদাহরণে তো দেখেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি কীভাবে তার ঘরকে আগুনে ছেড়ে দিয়ে নফল নামাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। লম্বা লম্বা সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোয়া করে স্ত্রী ও সন্তানদের অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দেওয়ার মিনতি করছিল। এই আচরণের কারণে সে কি গুনাহগার হবে না? অবশ্যই হবে।

এই কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীদেরও যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে। যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিতে হবে। এরপরই আল্লাহ তাআলা তাদের এই চেষ্টা ও সাধনায় বরকত দান করবেন।

এই কথাগুলো তাদের উদ্দেশেও বার্তা, যারা শরীয়াহ শাসনের দাবি জানায় অথচ তাদের অধিকাংশ সময় তারা অর্থহীনভাবে নষ্ট করে। না দুনিয়ার কল্যাণে ব্যয় করে, না আখেরাতের কল্যাণে। যে ব্যক্তি কোনো ধরনের যোগ্যতাই তৈরি করেনি—না সৃষ্টিশীল না গতানুগতিক। আপনার শিক্ষা কিংবা কর্মজীবনের ব্যর্থতার কারণে মানুষ আপনার দেওয়া শরীয়াহর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। আপনি যতই সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রমাণাদি পেশ করেন না কেন। মানুষ কখনো এটি কল্পনা করতে পারে না যে, কোনো ব্যক্তি যে কিনা সমাজের জন্যই বোঝা সে শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে পরিচালিত করবে। কারণ, দিনের বেলায় যে ঘুমোয় সে কীভাবে রাতে ঘুমন্তদের ফজরের আলো দেখাবে? অতএব শরীয়াহর দিকে যারা দাওয়াত দেবেন প্রত্যেকেরই এমন আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে, যার ডাকে ঘুমন্ত উম্মাহ জেগে উঠবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ: কেউ সততার সাথে শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দিল এবং অন্যান্য বস্তুগত উপায়ও অবলম্বন করল কিন্তু মানুষের সাথে তার আচরণ মন্দ। সে তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র। এমনকি দীনের কিছু বিষয়কে সাজিয়ে আগে বর্ণনা করতে পারার যোগ্যতা তার নেই। শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ব্যাপারে তার সততার কারণে ধারণা করা হয় সে সবকিছু জোড়াতালি দিতে সক্ষম হবে। অথচ এটি রাসূলের ﷺ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তিনি হযরত মুয়াজ ও আবু মুসা رضي الله عنهما-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

'লোকদের প্রতি কোমল আচরণ করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুখবর দেবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না।'[৪৮]

---

৪৮. সহীহ বুখারী: ৪৩৪১।

অন্য স্থানে হযরত মুয়াজ ﵁-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

وإياك وكرائم أموالهم

'মানুষের উত্তম মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে।'[৪৯]

এই হাদীসগুলোতে হযরত মুয়াজকে রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন, মানুষদের নিকট দীনকে উপস্থাপনের সময় কিছু বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করতে।

এই কারণে আমরা যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীদের এই দাবি জানাই, যেন তারা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করে, দীনের ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে, জনগণের প্রতিক্রিয়ার সামনে পিছু না হটে, তার মানে এই নয় যে, রাজনীতিতে মানুষের সাথে কঠোর আচরণ করতে হবে; বরং মনে রাখতে হবে, ইসলামপন্থীদের অন্যদের তুলনায় জনগণের সাথে অধিক নম্র ও কোমল আচরণের অধিকারী হতে হবে। দীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে শরীয়াহর গণ্ডির ভেতর থেকে সুন্দর রাজনীতি করে জনগণের হৃদয় জয় করতে হবে।

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমল স্বভাবের লোকদের যা দান করেন তা কঠিন স্বভাবের লোকদের দান করেন না।'[৫০]

অতএব শুধু শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট হবে না। এখন তৃতীয় একটি উদাহরণ বাকি আছে, যদিও তিন ব্যক্তির ঘটনার সাথে এর সামঞ্জস্য কম। তবে শুধু ঘোষণার ওপর সীমাবদ্ধ থাকার ভয়াবহতা এই উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে।

তৃতীয় উদাহরণ হলো তার ব্যাপারে, যে শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেবে ঠিকই, তবে বাস্তবে সে তার এই ঘোষণায় আন্তরিক নয়। মানবরচিত আইনে শাসন করার ঘোষণা দেওয়ার চেয়ে এই ধরনের অবস্থা কোনো অংশেই কম ভয়ংকর নয়। বলতে গেলে এটি ধ্বংসের পথ।

---

৪৯. সহীহ মুসলিম: ১৯। এই হাদীসে যাকাত গ্রহণের সময় একেবারে উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহর রাসূল। এর কারণ হলো, যাকাত নেওয়া হয় গরিবদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর উদ্দেশ্যে। তাই বেছে বেছে উত্তমটিই গ্রহণ করলে তা সম্পদশালী ব্যক্তিকে ক্ষতিতে ফেলে দেবে; বরং তার কাছ থেকে মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করা হবে।

৫০. সহীহ মুসলিম: ২৫৯৩।

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

'তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত।'[৫১]

শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা কখনোই যথেষ্ট নয়। এই ঘোষণার কী উপকারিতাই-বা রয়েছে, যদি বিনিয়োগের নামে উম্মাহর সম্পদ শত্রুদের হাতে হস্তগত করা হয়, অস্ত্রচুক্তির নামে অস্ত্র আমদানি করে উম্মাহর বুকে চালানো হয়? সে রাষ্ট্রের শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়ার কী প্রয়োজন, যে রাষ্ট্র শত্রুদের বিমানগুলোর পাথেয় জোগায়? তাদের জন্যে নিজ ভূখণ্ডে সেনা ছাউনির অনুমতি দিয়ে দেয়, যাতে তারা এর সাহায্যে অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে লুণ্ঠন চালাতে পারে? যে রাষ্ট্রে আত্মমর্যাদাশীল উলামা, সৎকাজে আদেশ দানকারী ও অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী দায়ীদের গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়? আর অন্যদিকে প্রতারকদের জন্যে আল্লাহর দীনের ওপর মিথ্যাচারের সুযোগ করে দেওয়া হয়? যে রাষ্ট্রে মসজিদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, মজলুমদের জন্যে দোয়া নিষিদ্ধ করা হয়? সে রাষ্ট্রে শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়ার কী প্রয়োজন যেখানে ঘোষণাকারী সম্পদের সমুদ্রে ডুবে আছে আর অন্যদিকে লক্ষ-কোটি মুসলিম ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে?

এসব কিছু কি শরীয়াহ বাতিলের নামান্তর নয়? বরং শরীয়াহর ওপর যুদ্ধ ঘোষণা নয়?

শরীয়াহ প্রয়োগের ঘোষণাকে ঢাল বানিয়ে এর পেছনে সমস্ত ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা হলে এই ঘোষণা আল্লাহকে কখনো সন্তুষ্ট করবে না; বরঞ্চ শরীয়াহর এই বিকৃত রূপ আল্লাহর শত্রুদেরই সন্তুষ্ট করবে। যেহেতু এই ঘোষণা সত্ত্বেও শত্রুদের স্বার্থ বাকি আছে, মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন করার পথ এখনো খোলা আছে, মুসলিম যুবকদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাচ্ছে, তাহলে আর ক্ষতি কোথায়? রাষ্ট্র যদি শরীয়াহর নাম

---

৫১. সহীহ বুখারী: ৪৩০৪।

নিয়ে দুর্বলদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করে তাহলে শত্রুদের তো এই শরীয়াহর সাথে কোনো শত্রুতা নেই; বরং এটি তো তাদের লাভই বয়ে আনছে। কারণ, শরীয়াহর এই বিকৃত রূপ অনেকের অন্তরে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রতি ঘৃণা ও ভয় জন্মিয়ে দেবে। তারপর আমরা যখন শরীয়াহ প্রয়োগের আহ্বান জানাব তারা আমাদের সে বিকৃত রূপের ভয়ংকর অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লজ্জা দিতে পারবে!

এই পন্থায় যারা শরীয়াহ প্রয়োগ করেন, তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে মুসলিমদের ওপর অত্যাচারে অংশগ্রহণ করাকে সমর্থন করেন। তারা সম্পদ রক্ষা ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শরীয়তের উদ্ধৃতিগুলো নিজেদের সমর্থনে দাঁড় করান। যেভাবে উদাহরণে বর্ণিত দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে দিয়ে সম্পদ রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

তিন ব্যক্তির ঘটনায় দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এটি ছিল আমাদের বিশ্লেষণ। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকবে তৃতীয় ব্যক্তির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে। সেটি ইনশাআল্লাহ বিভিন্ন শিক্ষায় পরিপূর্ণ হবে। আমরা সেখানে আলোচনা করব সে সমস্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মী সম্পর্কে, যারা ক্ষমতার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে তাদের আচরণ ছিল তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায়।

এই পর্বের সারকথা হলো, শুধু শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা যথেষ্ট নয়; বরং এটি প্রয়োগে আন্তরিক থাকা আবশ্যক। আর সফল হতে হলে উত্তম রাজনীতি ও বিভিন্ন বস্তুগত উপায় অবলম্বন করা জরুরি।

ইসলামী সংগঠনগুলো কেন বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা এখনো তিন ব্যক্তির ঘটনা এগিয়ে নিয়ে চলেছি। অনেকেই বলবেন: এই কাহিনিতে ধারাবাহিক হওয়ার এখন কীই-বা প্রয়োজন? এই সিরিজটিরও তো এখন কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। আরব বসন্তের উত্তাপ এখন নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার যে সামান্য আশাটুকু বাকি ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

আমি বলব, ভাইয়েরা, বরঞ্চ এ সমস্ত আলোচনার দিকে আমরা এখন আগের তুলনায় আরও বেশি মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾

'যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণা তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'[৫২]

অথচ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে ইসলামপন্থী দলগুলো বারবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাহলে আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, আমরা যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সৈনিক, আমাদের নিজেদের মধ্যেই ধৈর্য ও তাকওয়ার ঘাটতি রয়েছে। নবীজির পথে চলতে গিয়ে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোতে আমরা যথাসাধ্য ধৈর্য ধরছি না। আবার আল্লাহর যতটুকু তাকওয়া কাম্য, আমাদের মাঝে তা ততটুকু নেই।

আমার ভাইয়েরা, আমাদের রবের কিতাব ও ইতিহাসের পাতা থেকে শুরু করে বর্তমান বাস্তবতা পর্যন্ত আমাদের এই কথা জানান দেয় যে, মুনাফিক ও কাফিরদের চক্রান্ত ভয়ংকর কিছু নয়।

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

'শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।'[৫৩]

আমি অন্তত আমেরিকা, জায়োনিস্ট[৫৪] ও মুসলিম বিশ্বে তাদের ভাড়াটে বাহিনীর চক্রান্তে ভীত নই। কেননা, আল্লাহ কুরআনে অনেক আয়াতে তাদের একেবারেই তুচ্ছ ঘোষণা করেছেন।

﴿وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾

'তাদের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হওয়ারই।'[৫৫]

---

৫২. সূরা আলে ইমরান: ১২০।

৫৩. সূরা নিসা: ৭৬।

৫৪. জায়নবাদ হলো ইহুদিদের একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষভাগে মধ্য ইউরোপে এই চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। ফিলিস্তিনকে পিতৃভূমি আখ্যা দিয়ে একে একমাত্র ইহুদিদেরই মাতৃভূমি বলে তারা দাবি করে। তারা মনে করে এই ভূমিতে থাকার অধিকার শুধু ইহুদিদের। আর তাদের রাষ্ট্র হতে হবে ইহুদি রাষ্ট্র। তাদের বিছানো জাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হেনরী ফোর্ড এর 'সিক্রেটস অব জায়োনিজম' বইটি।

৫৫. সূরা ফাতির: ১০।

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ﴾

'অতএব দেখো তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি।'[৫৬]

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾

'কুচক্র কুচক্রীদেরই একমাত্র ঘিরে ধরে।'[৫৭]

﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

'তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।'[৫৮]

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾

'নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অচিরেই তারা আরও ব্যয় করবে। তারপর এটিই তাদের জন্যে আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে।'[৫৯]

এ ছাড়া তাদের হাজারো থিংকট্যাংক আছে। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, গণমাধ্যম, রণবিদ্যা থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত শাখায় তাদের বিজ্ঞানী ও গবেষক আছে। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ব্যতীত তাদের আর কোনো চিন্তাই নেই। হাজারো বেতারকেন্দ্র, পেপার পত্রিকা, টিভি অনুষ্ঠান ইসলাম ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত আছে। এতকিছু সত্ত্বেও তাদের এই হম্বিতম্বি আমাকে মোটেও চিন্তায় ফেলে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদের বিষয়টিকে একেবারে ছোট করে দেখিয়েছেন, তাদের এতসব পরিশ্রমকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা দিয়েছেন আর আমাদের আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তাদের ভয়ে ভীত হয়ে না পড়ি।

---

৫৬. সূরা নামল: ৫১।

৫৭. সূরা ফাতির ৪৩।

৫৮. সূরা আনআম: ১২৩।

৫৯. সূরা আনফাল: ৩৬।

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

'সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কোরো না। আমাকেই একমাত্র ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।'[৬০]

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾

'অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় না করে আমাকেই ভয় করো।'[৬১]

তবু আমরা ভীত কেন? আমরা ভীত কারণ, আমরা আল্লাহর সঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, অধিকাংশ ইসলামপন্থী দল আল্লাহর সঙ্গ হারিয়ে ফেলেছে। তাই শত্রুদের অল্প ষড়যন্ত্রও তাদের ক্ষতিতে ফেলে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾

'এবং তাদের চক্রান্তের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়বেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে।'[৬২]

ওয়াল্লাহি! উম্মাহর এই দুর্যোগপূর্ণ হালতে আমাদের অধিকাংশই এখন আর আল্লাহকে ভয় করেন না, নবীজির পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ করেন না। তাই আল্লাহর সঙ্গ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন। এই তিক্ত বাস্তবতাকে স্বীকার করুন, সত্যিই আমাদের অধিকাংশ এখন আল্লাহর সঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

'এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদের মু'মিনদের ওপর বিজয় দান করবেন না।'[৬৩]

---

৬০. সূরা আলে ইমরান: ১৭৫।

৬১. সূরা মায়েদা: ৪৪।

৬২. সূরা নাহল: ১২৭-২৮।

৬৩. সূরা নিসা: ১৪১।

অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাফিরগণ কত শত উপায়ে আমাদের ওপর বিজয় অর্জন করেছে। অন্যদিকে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনোই ভঙ্গ করেন না। তাহলে মূল সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমাদের ঈমানে। অধিকাংশ ইসলামপন্থীদের ঈমানে। এই আয়াতেই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

"এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদের মুমিনদের ওপর বিজয় দান করবেন না।"

এখানে প্রতিশ্রুতি মু'মিনদের জন্যে। অথচ আমাদের অধিকাংশই তো এখন এমন, যাদের আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি ঈমান দুর্বল হয়ে আছে, যারা বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণকে আঁকড়ে ধরে আছেন, বারবার আপস করছেন, ছাড় দিচ্ছেন, নবীর দেখিয়ে দেওয়া পথকে দীর্ঘ মনে করে এক লাফে ফসল কাটতে মনস্থির করছেন, জালিমদের সামনে ঝুঁকে পড়ছেন। এই কারণেই কাফিরগণ শত উপায়ে আমাদের ওপর বিজয় অর্জন করেছে। আজকের এই ব্যর্থতা এসবেরই ফসল।

﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

'এটি আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। তারা শুধু জানে পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো।'[৬৪]

আমরা দুনিয়ার বাহ্যিক উপকরণগুলোর সাথে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছি। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা যে কাজগুলো আদায় করলে পূরণ করবেন বলে আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন সেগুলোকেই আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের এহেন আচরণের কারণে আল্লাহ শত্রুদের হাতে আমাদের একা ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তাদের ষড়যন্ত্রের সামনে আমাদের শত কৌশল আর টিকেনা। আল্লাহর সঙ্গ ব্যতীত আমরা তাদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল। আমাদের থিংকট্যাংক একটিও নেই, যেখানে তাদের রয়েছে হাজারো। আমাদের যেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র নেই, সেখানে তাদের রয়েছে অনেক রাষ্ট্র। কোনো ইসলামী বাহিনী নেই আমাদের, অথচ তাদের অসংখ্য। শুধু আল্লাহর সঙ্গ যদি আমাদের থাকত তাহলে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারত না; বরঞ্চ তিনিই আমাদের সব কৌশল শিখিয়ে দিতেন, আমাদের জন্যে তিনি যথেষ্ট হতেন।

৬৪. সূরা রোম: ৬-৭।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾

'তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, আর আমিও চক্রান্ত করি।'[৬৫]

এমন বলেননি যে, তারাও চক্রান্ত করে বিপরীতে তোমরাও চক্রান্ত করো। কারণ, আমরা অনেক বেশি দুর্বল। আল্লাহর সঙ্গ ব্যতীত কাফিরদের চক্রান্তের সামনে টিকতে পারার ক্ষমতা আমাদের নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

'তারা যেমন ষড়যন্ত্র করে তেমনি আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। বস্তুত আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম কৌশলী।'[৬৬]

তিনি বলেননি: তারা যেমন ষড়যন্ত্র করে তোমরাও ষড়যন্ত্র করো।

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে প্রতিরোধ করবেন।'[৬৭]

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?'[৬৮]

অতএব, সত্যিকার মুমিন ও আল্লাহর বান্দা হওয়া ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপায় নেই। শুধু এর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের পক্ষে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও কৌশল অবলম্বন করবেন, আমাদের জন্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

সমস্যা আমরা যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মী তাদের নিজেদের মাঝেই। একদিকে আল্লাহ যেমন তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না অন্যদিকে কাফিরদের ষড়যন্ত্র মু'মিনদের

---

৬৫. সূরা তারেক: ১৫-১৬।

৬৬. সূরা আনফাল: ৩০।

৬৭. সূরা হজ্জ: ৩৮।

৬৮. সূরা যুমার: ৩৬।

ক্ষতি করে না। অতএব সমস্যা যেহেতু আমাদের মাঝেই, তাই ফিরে আসতে হবে আমাদেরই। এখন আবার অনেকে হা-হুতাশ ও মাতমে সময় অতিবাহিত করছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিভিন্নভাবে অভিশাপ দিচ্ছেন, আর সব সমস্যায় তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকেই শুধু দোষারোপ করছেন। না প্রিয় ভাই, এভাবে নয়!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যদি সঠিক পথে থাকো, তাহলে পথভ্রষ্ট কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[৬৯]

হাঁ, তাদের বদদোয়া দিন। কিন্তু এটি ভাবতে যাবেন না যে, সমস্যা সব তাদের কারণেই; বরং যদি আমরা নিজেদের যথাযথভাবে আল্লাহর সঙ্গে আঁটকে রাখতাম, তাদের ষড়যন্ত্রের সামনে তিনিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেতেন। যদি আমরা বাস্তবেই সঠিক পথে থাকতাম তাহলে পথভ্রষ্টদের বিছিয়ে দেওয়া জাল আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম হতো না। তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যদি সঠিক পথে থাকো, তাহলে পথভ্রষ্ট কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

অতএব তাদের ভ্রষ্টতায় সময় নষ্ট না করে নিজেকে সঠিক পথের অনুসরণে ব্যস্ত রাখুন। তখন তাদের ভ্রষ্টতা আপনার কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে না।

ইসলামপন্থীদের সাহায্যে এগিয়ে না আসায় অনেকেই জনগণের সমালোচনা করেন। গণমাধ্যমের মিথ্যাচারে আস্থা রাখায় তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। না প্রিয় ভাই, এমনটা উচিত নয়। সমস্যা আমাদেরই। আমরাই যদি রাসূলের পথকে আঁকড়ে ধরতাম, আল্লাহর ভালোবাসার উপযুক্ত হতাম তাহলে অবশ্যই তিনি জমিনে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিতেন। মুসলিমের হাদীসে এসেছে:

ثم يوضع له القبول في الأرض

'তারপর যমীনে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।'[৭০]

---

৬৯. সূরা মায়েদা: ১০৫।

৭০. সহীহ মুসলিম: ২৬৩৭।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা তৈরি করেন।'[৭১]

আমরা এমন অনেক দায়ী ও ইসলামপন্থীকে দেখেছিলাম, যারা গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন। কিন্তু যখনই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন উপকরণকে আঁকড়ে ধরেছিলেন ও সমঝোতার খাতিরে অনেক কিছুতে ছাড় দিতে শুরু করেছিলেন তারা আল্লাহর সঙ্গ ও জনগণের ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ওহে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মী, নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর পেছনে সময় নষ্ট করবেন না। হতাশা, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাকে ছুড়ে ফেলে দিন। এগুলো আপনার কোনো উপকারই করবে না। নিজের দিকে মনোযোগী হোন, সমস্যা সেখানেই খুঁজে পাবেন।

﴿قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾

'তখন তোমরা বলেছিলে, এটি কোথা থেকে এল? আপনি বলে দিন, এ কষ্ট তোমাদের নিকট পৌঁছেছে তোমারই কারণে।'[৭২]

বাস্তবতাকে মেনে নিন, আমরা আল্লাহর সঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি। এ-কারণেই শত্রুদের ষড়যন্ত্র আমাদের ক্ষতি করতে পারছে।

এতকিছু বলার পর এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন আগের তুলনায় এই সিরিজটি চালিয়ে যাওয়া আরও বেশি প্রয়োজনীয়? শরীয়াহকে সঠিকভাবে বোঝা, কতটুক পরিবর্তন আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতি বলে ধর্তব্য হবে না তা জানা, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কতটুকু উপায়-উপকরণের শরণাপন্ন হলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থাকবে তা বুঝতে পারা আগের তুলনায় এখন আরও বেশি প্রয়োজনীয়। কেননা, সমাজে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তা খোদ ইসলামপন্থীদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। যেটুকু বৈধ সেটুকু উপায়-উপকরণের আমরা শরণাপন্ন হব এরপরই

---

৭১. সূরা মারয়াম: ৯৬।

৭২. সূরা আলে ইমরান: ১৬৫।

আল্লাহ এতে বরকত ঢেলে দেবেন। আমরা আরব বসন্তে দেখেছিলাম কীভাবে আল্লাহ তাআলা পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছিলেন, আমাদের ধারণাতীত সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস! আমরা তা কাজে লাগাতে সক্ষম হইনি।

অপরদিকে যদি, শরীয়াহর প্রতি আমাদের বুঝ বিকৃত হয়। আমরা যদি এমন ভাবি যে, শরীয়াহর কিছু অংশ প্রয়োগ করে কিছু অংশ না করলেও অসুবিধে নেই, যদি মনে করি যে, অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেও শরীয়াহ প্রয়োগের দিকে এগোনো যায়, যদি নিজেকে ইসলামপন্থী দাবি করার পরও শরীয়াহর কিছু আইনকে আমরাই এড়িয়ে যাই, যদি ক্ষমতায় আরোহণের আগেই বিভিন্নভাবে ছাড় দিয়ে আসি, তাহলে আল্লাহ কখনোই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার সম্মান আমাদের হাতে অর্পণ করবেন না। শরীয়াহর পথে যারাই দায়ী হবেন প্রত্যেকেরই রাসূলের যোগ্য উত্তরসূরি হতে হবে।

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

'আল্লাহ অধিক অবগত যে, তিনি কার ওপর স্বীয় পয়গাম স্থাপন করবেন।'[৭৩]

বেছে বেছে উপযুক্ত ব্যক্তিদের ওপরই যেভাবে আল্লাহ তাঁর রিসালাতকে রেখেছেন, ঠিক সেভাবেই তিনি তাঁর শরীয়াহ প্রয়োগের জন্যেও উপযুক্ত ব্যক্তিদেরই নির্ধারণ করবেন।

আমার ভাইয়েরা, এই সিরিজের মূল উদ্দেশ্য হলো, শরীয়াহর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভাব তৈরি করা। এই সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক বা নাহোক আমরা যেন আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারি, যে অবস্থায় আমাদের অন্তরে শরীয়াহর প্রতি কোনো ধরনের বিকৃত মনোভাব থাকবে না। এটি তো সে শরীয়াহ, যার ওপর ঈমান আনা, যাকে ভালোবাসা ও বোঝা আমাদের জন্যে ইবাদতস্বরূপ।

তিন ব্যক্তির ঘটনায় তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্র অনুসন্ধান করার আগে এই কথাগুলো ভূমিকাস্বরূপ বলা প্রয়োজন ছিল।

এই পর্বের সারকথা হলো: আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সঙ্গ পেতে ও জমিনে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে শরীয়াহকে সঠিকভাবে বোঝা অনেক বেশি প্রয়োজন।

---

৭৩. সূরা আনআম: ১২৪।

অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু রোগী মৃত!

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা অষ্টম পর্বে এমন তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, যারা তাদের ঘরের দিকে ফিরে এসে ঘরকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখেছিল। আমরা বলেছিলাম, বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামপন্থীদের আচরণ তৃতীয় ব্যক্তির মতো। তো তৃতীয় ব্যক্তির আচরণ মূলত কেমন ছিল?

এই ব্যক্তির সন্তানেরা খেলাধুলায় সময় নষ্ট করত, প্রতিবেশীরা তাকে পছন্দ করত না। কারণ, সে তাদের তার ঘরে গান ও মদের আসর বসাতে বাধা দিত। আর এখন এমন কিছু মানুষ আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছে, তারা আগুন নেভানোর বিনিময়ে এই লোকটির নিকট তার স্ত্রীকে এক রাতের জন্যে ভাড়া চাইছে। তো আমাদের গল্পের চরিত্রটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল: প্রিয় সন্তানেরা, তোমাদের রক্ষা করতে যদি আমায় সাহায্য করো, কথা দিচ্ছি তোমাদের আমি ইচ্ছেমতো খেলতে দেব। ওহে আমার প্রতিবেশীরা, আমাকে এখন তোমরা সহযোগিতা করলে আমি তোমাদের ঘরের চাবি দিয়ে দেব। সেখানে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। আর তোমরা যারা আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছ! তোমরা আগুন থামিয়ে দাও, এক রাত ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে দেখব।

এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কী করল? সে কল্পিত একটি অর্জনের বিনিময়ে অনেক বড় ছাড় দিয়ে বসল। সে তার পরিবারকে বাকিতে বিক্রয় করে দিল। মূল্য গ্রহণ করার পূর্বেই প্রতারক ক্রেতার নিকট পণ্য সমর্পণ করল। যেসব বিষয় দরদাম করা যায় না, সেগুলোও পাল্লায় তুলল। লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে, আগেই লক্ষ্যকে বেচে দিল!

মনে রাখবেন! ইন্ধন জোগান দেওয়া সে লোকগুলো আগুন লাগানো থেকে কখনো বিরত হবে না।

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে যদি তারা সক্ষম হয়, তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে।'[৭৪]

---

৭৪. সূরা বাকারা: ২১৭।

এই প্রতিবেশীরা কখনোই তার মঙ্গল করবে না, নিজেকে তাদের দলে ভিড়িয়ে না নিলে কখনোই তারা সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আবার তাদের সাথে না ভিড়লে এদের বক্তব্য হবে এমন,

﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾

'এদের শহর থেকে বের করে দাও। এরা তো দেখা যায় খুব সাধু।'[৭৫]

আর যদি এই ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে সন্তানদের খুশি করে তাহলে সে তার সন্তানদের কখনোই বিশ্বস্ত পাবে না। যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষদের সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষদেরও তার ওপর অসন্তুষ্ট করে তোলেন। তাই এই ব্যক্তির সব অর্জনই হলো কাল্পনিক। কিন্তু এই অস্তিত্বহীন অর্জনগুলোর বিনিময়ে সে চড়ামূল্য নির্ধারণ করেছে। স্ত্রীর সম্ভ্রম, ঘরের পবিত্রতা ও সন্তানদের চরিত্রকে সে পাল্লায় তুলতে রাজি হয়েছে।

এই গল্পটির চরিত্রগুলোকে সময়ের সাথে মিলাতে খুলে খুলে বর্ণনা করার এখন কোনো প্রয়োজনীয়তা কি আছে? তবুও বলি; গল্পটির স্ত্রী হলো শরীয়াহ, সন্তানেরা হলো জনগণ, মন্দ প্রতিবেশী হলো আমাদেরই ভেতরকার সেক্যুলার, মুনাফিক ও শরীয়াহবিরোধী জোট।

আমাদের মূল চরিত্রের ব্যক্তিটি শুরুতেই ভেবেছিল যে, সে তার স্ত্রী, সন্তান ও ঘর রক্ষা করছে। কিন্তু সে দেখল এই লক্ষ্যে পৌঁছানো বস্তুগত ধারণায় অসম্ভব। তারপর সে লক্ষ্য পূরণ করার উদ্দেশ্যে লক্ষ্যের ক্ষেত্রেই আপস করা শুরু করল! তার ধারণা অনুযায়ী স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করতে গিয়ে সে তাদেরই বেচে দিল!! লক্ষ্যে পৌঁছানোর সিঁড়ি কিনতে লক্ষ্যকেই মূল্য হিসেবে পরিশোধ করল!!! যদি সে সিঁড়িতে চড়তেও পারে শূন্যস্থান ছাড়া কিছুই পাবে না, কারণ যা পাওয়ার কথা তা সিঁড়ি কিনতেই সে ব্যয় করে ফেলেছে। এই ব্যক্তির জন্যে যদি আগুন নিভিয়েও দেওয়া হয় তাহলে আর কী লাভ রয়েছে? স্ত্রীকে তো শত্রুর নিকট সোপর্দ করতে হবে, সন্তানদের প্রবৃত্তির নিকট, ঘরের সম্মানকে এমন প্রতিবেশীদের নিকট, যারা এর সম্মানহানি ঘটাবে।

---

৭৫. সূরা আ'রাফ: ৮২।

ঠিক একইভাবে ইসলামপন্থীগণ যদি ক্ষমতায় আরোহণ করেন তাহলে তারা আর কীভাবেই-বা উপকৃত হবেন? কারণ, ইতিপূর্বে তারা শরীয়াহকেই মূল্য হিসেবে পরিশোধ করে এসেছেন। তারা কথা দিয়ে এসেছেন, সেক্যুলারদের সাথে মিলিত জোট সরকার গঠন করা হবে। জনগণের সমর্থন আদায়ে তাদের নষ্ট চাহিদাও বাস্তবায়ন করা হবে।

তখন তারা ক্ষমতায় আরোহণ করলেও এটাই বলতে হবে যে, অপারেশন সাকসেসফুল তবে রোগী মৃত!

যখন আমরা বলি 'ইসলামপন্থী' কিংবা 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মী' তখন কোনো পরিচয় তাদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করে? তাদের ভিশন ও উদ্দেশ্য কী থাকে? মহান আল্লাহ উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন:

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾

'তারা এমন লোক, যাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।'[৭৬]

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার অর্থ হলো, তারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করবে ও তাঁর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন।'[৭৭]

---

৭৬. সূরা হজ্জ: ৪১।

৭৭. সূরা নূর: ৫৫।

অতএব ইসলামপন্থীদের নিকট অবশ্যই চাহিদা থাকবে যে, তারা খিলাফাহ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে।

যে উদ্দেশ্যে আমরা শাসনক্ষমতা চাই সে উদ্দেশ্যকেই যদি দরাদরি করতে পাল্লায় তুলি, ক্ষমতায় আরোহণ করতে যদি উদ্দেশ্যকেই বিসর্জন দিয়ে দিই, তাহলে লাভ আর কী হলো? মাধ্যমের কারণে উদ্দেশ্যকে বিক্রয় করে দেওয়া কি কখনোই গ্রহণযোগ্য?

আরেকটি উদাহরণ দিই? কল্পনা করুন আপনি এমন কোনো এতিমখানা চেনেন, যার পরিচালনা পরিষদ অনেক বেশি জালিম ও নীচ প্রকৃতির। তারা এতিমদের কাপড় দেয় না। উলটো তাদের উলঙ্গ করে রাখেন। তো একদিন আপনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এক ব্যাগ কাপড় নিয়ে মুক্তির স্লোগান দিতে দিতে এতিমখানার উদ্দেশে রওনা দিলেন। এতিমখানার দরজায় আপনাকে বাধা দিয়ে জানানো হলো, ভেতরে কাপড় প্রবেশ নিষেধ। আপনি অনেক দরাদরি করলেন, তাদের সাথে লম্বা আলোচনা করলেন কিন্তু তারা অনড়। আপনি মনে মনে ভাবলেন, অসুবিধে নেই। এতিমদের নাহয় নিজের কাপড় দিয়েই ঢাকব। আপনি কাপড়ের ব্যাগ দরজায় রেখে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু না আরও একটি দরজা। প্রহরী বলল: ওভারকোট পরিহিত কেউ ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। এটিও আপনি মেনে নিলেন। গায়ে জড়ানো ওভারকোটটি রেখে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু না, আরেকটি দরজা। একের পর এক দরজা। শর্ত পূরণ করতে করতে সব দরজা অতিক্রম করে একসময় আপনি আবিষ্কার করলেন যে, লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড়টিই এখন শুধু বাকি। আপনি ভাবলেন: এখনো তো এতিমদের দেওয়ার মতো কিছু আমার বাকি আছে! তারা যখন আমার লজ্জাস্থান ঢাকা দেখবে তখন নিশ্চয় তাদেরও ঢাকতে ইচ্ছে করবে। তখন আমার সাথে মিলে তারা এই জালিম ও ইতর প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। লক্ষ করুন, যে ব্যক্তি মুক্তির স্লোগান দিতে দিতে এতিমখানায় এসেছিল তার প্রত্যাশা কোথায় এসে ঠেকেছে। যদি সে শুরু থেকে জানত যে, এই ছাড় দেওয়ার পরিণামে অর্জন কতটুকু হবে সে কখনো কি এমনটা করত? নিশ্চয় না। মনে রাখবেন এভাবে ছাড়প্রদান আল্লাহর আদেশবিরোধী কাজ।

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

'শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।'[৭৮]

---

৭৮. সূরা বাকারা: ১৬৮।

শয়তান তো সে,

﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

'যে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।'[৭৯]

প্রিয় ভাইয়েরা, শিরোনাম দেখেই লেখার বিষয়বস্তু পড়া হয়ে যায়। শরীয়াহর শত্রুরা আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের বস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তারা উলঙ্গ। তাই কাউকে আবৃত দেখলে তাদের ভেতরটা জ্বলে ওঠে। যারা তাদের অনুসরণ করতে করতে তাদের ন্যায় উলঙ্গে পরিণত হবে, যারা দরজায় দাঁড়িয়ে আবৃতদের প্রবেশে বাধা দেবে, ক্ষমতায় আরোহণ করা শুধু তাদের জন্যেই সম্ভব রাখা হবে। তবে ইসলামপন্থীদের কী লাভটা হবে, যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে দরজায় সে শরীয়াহকে রেখে আসতে হয়, যে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্যেই তারা মূলত শাসনক্ষমতায় আরোহণ করতে চেয়েছিলেন!

অতএব প্রিয় ইসলামপন্থী ভাইয়েরা, নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। আপনারা কি রাষ্ট্রের কল্যাণে ক্ষমতা চান নাকি শরীয়াহ ও আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতা চান? যদি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা চান, তাহলে কোনো মাধ্যম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্যকেই বিসর্জন দিতে যাবেন না।

আমি জানি আমার এই কথাগুলো থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি হবে। কেউ বলবেন: রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশের শুরুর দিকে আমাদের ইচ্ছা থাকবে যথাসম্ভব পরিস্থিতির উন্নয়ন। শুরুতেই আমরা শরীয়াহ প্রয়োগ করতে চাই না। আর কেউ বলবেন: কেন আপনি এগুলোকে কল্পিত অর্জন বলছেন? এই অর্জনগুলো কি বাস্তবিক নয়? আবার অনেকে বলবেন: আপনি কেন এমন বলছেন যে আমরা শরীয়াহর প্রশ্নে ছাড় দিচ্ছি, আপস করছি? কই শরীয়াহর ব্যাপারে আমরা তো বিন্দুমাত্রও ছাড় প্রদান করিনি।

এই সব প্রশ্নের উত্তর ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে আমি আমার ইসলামপন্থী ভাইদের থেকে আশা করব, যারা পার্লামেন্টভিত্তিক

---

৭৯. সূরা নিসা: ১২০।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন কিংবা যারা তাদের এই পদ্ধতিকে সমর্থন করছেন তারা যেন নিম্নোক্ত ছয়টি প্রশ্নের জবাব খোঁজেন।

১. এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্য কী?

২. শুরুতে কী কী ছাড় আপনারা দিয়ে এসেছেন? অন্যভাষায় বললে, কোন কোন মাফসাদা কিংবা ক্ষতি আপনারা গ্রহণ করে নিয়েছেন?

৩. কী কী অর্জন করতে বা কোন কোন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে আপনারা এই ক্ষতিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন?

৪. প্রথম থেকেই যা অর্জন করার আপনারা আশা করেছিলেন তা কি এখনো বাকি আছে নাকি ধীরে ধীরে আপনাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসছে?

৫. যদি উত্তর এমন হয় যে, অর্জনের প্রত্যাশা কমে আসছে। তাহলে আপনারা এর বিনিময়ে কি ছাড় দেওয়ার পরিমাণও কমিয়ে ফেলছেন? যাতে অর্জন ও ছাড়দেওয়ার মাঝে ভারসাম্য তৈরী হয়?

৬. বর্তমান পার্লামেন্টভিত্তিক রাজনীতিতে আপনারা যারা ইসলামপন্থী আছেন তারা শক্তিশালী নাকি দুর্বল?

আমি আশা করব, আমাদের যে ভাইয়েরা নির্বাচনকেন্দ্রিক পার্লামেন্টভিত্তিক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন কিংবা তাদের যারা সমর্থন করেন তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। যাতে আগামী পর্বে আমরা বর্তমান ইসলামপন্থার কর্মপদ্ধতি সহজেই বুঝতে পারি আর তারা কি নিজেদের লক্ষ্যকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন নাকি লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছেন তাও আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়।

এই পর্বের সারকথা হলো, শাসনক্ষমতায় পৌঁছাতে যে মাধ্যম অবলম্বন করা হয় তা অবশ্যই ইসলাম-সম্মত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ক্ষমতায় আরোহণের মূল লক্ষ্য হলো দীন প্রতিষ্ঠা ও শরীয়াহ প্রয়োগ। মাধ্যম অবলম্বন করতে গিয়ে যদি মূল লক্ষ্যে ছাড় দেওয়া হয় তাহলে এর পরিণতি কখনোই ভালো হবে না।

বর্তমান ইসলামপন্থা ও লক্ষ্যহীনতা

প্রিয় ভাইয়েরা, প্রত্যেকটি প্রকল্প সফলতার মুখ তখন দেখবে যখন লক্ষ্য ও সক্ষমতার পরিমাণ আপনার নিকট স্পষ্ট থাকবে। যখন ধারাবাহিকভাবে আপনি কর্মসম্পাদন করে যাবেন, তারপর সে অনুযায়ী পরিকল্পনা ও মাধ্যম গ্রহণ করবেন। তাই নির্বাচনকেন্দ্রিক পার্লামেন্টভিত্তিক রাজনীতিতে যারা যোগ দিয়েছেন কিংবা যারা তাদের এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেন তাদের প্রতি ছয়টি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আমি গত পর্ব শেষ করেছিলাম। যাতে তাদের এই পদ্ধতির পরিণতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি।

এখন আসুন সে ছয়টি প্রশ্ন আমরা এবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি।

প্রথম প্রশ্ন: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্য কী সেটি নির্ধারিত করে বলুন।

যারা গণতন্ত্রপন্থী ইসলামিস্টদের আচরণের দিকে গভীর দৃষ্টি রাখেন, তারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, লক্ষ্য নির্ধারণে ইসলামপন্থীদের মাঝে জটিলতা রয়েছে। কখনো তাদের ঘোষণা থাকে: আমাদের লক্ষ্য হলো খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও কুদসকে এর রাজধানী ঘোষণা। আর এর মাধ্যমে উম্মাহর মর্যাদা আবার ফিরিয়ে আনা। আবার অন্য সময় তারা লক্ষ্য পাল্টে ফেলে বলেন: মন্দ ও ক্ষতির পরিমাণ কমানো, অবশিষ্ট ইসলামী পরিচয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, নষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোকে আবার ক্ষমতায় আসা থেকে বাধা প্রদান। কারণ—তাদের বক্তব্য অনুযায়ী—যদি এই দলগুলো আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে এই যমীনে আর আল্লাহর ইবাদত করা হবে না।

আবার তারা সুর পাল্টিয়ে বলেন: আমাদের উদ্দেশ্য হলো শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা আর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইসলামীকরণ।

কখনো আবার বলেন: আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি, এই পার্লামেন্টভিত্তিক রাজনীতি দ্বারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে আমাদের লক্ষ্য হলো পার্লামেন্টে হকের কথা বলা, ইসলামী ঘরানাকে রাজনীতি সচেতন করা ও দা'ওয়াহর ওপর চলমান সরকারি নিয়ন্ত্রণকে লঘু করা।

তাহলে উদ্দেশ্য কি সত্যিই খিলাফাহ ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা নাকি আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় সংস্কার করা?

আমরা দেখতে পাই, পার্লামেন্টপন্থী অধিকাংশ ইসলামিস্টগণ জনগণের আস্থা অর্জন করতেই মূলত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা ও শরীয়াহ প্রয়োগের মতো চিত্তাকর্ষক স্লোগানগুলো তোলেন। তারপর তারা যখন তিক্ত বাস্তবতার সম্মুখীন হন, যখন বুঝতে পারেন যে, নির্বাচন ও পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের কারণে অনেক বেশি সময় নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছে, বিষয়টি আরও জটিল রূপ ধারণ করেছে তখন তারা সুর পালটে বলেন, এই পন্থায় আমরা আসলে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবি করিনি। আমাদের ইচ্ছা তো মন্দ ও ক্ষতির পরিমাণ কমানো, আর দা'ওয়াহর ওপর চলমান সরকারি নিয়ন্ত্রণ লঘু করে এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা।

তাদের এই বৈপরীত্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের আবেগ নিয়ে না খেলে তাদের উচিত ছিল শুরু থেকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা। শেষে তো তারাই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনোভাবেই সে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। কোনো ইসলামপন্থী ব্যক্তির তো এমন হওয়া উচিত নয়, যে ঘর থেকে বের হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভবঘুরে হয়ে হাঁটবে, তার কোনো গন্তব্যস্থল নির্ধারিত থাকবে না!

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত নাকি, সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে?'[৮০]

তাই প্রথম থেকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। কারণ,

প্রথমত: লক্ষ্যের মধ্যেই অস্পষ্টতার কারণে ইসলামপন্থীগণ সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সাময়িক সাফল্য কতটুকু সেটি নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন না। কারণ, যে লক্ষ্য তারা বাস্তবায়ন করতে চান সেটিই তো নির্ধারিত নয়।

দ্বিতীয়ত: যে সমস্ত শায়েখগণ পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন তাদের অধিকাংশই কিছু শর্তের ভিত্তিতে একে বৈধতা দেন। শর্ত হলো, একটি সার্বজনীন,

---

৮০. সূরা মুলক: ২২।

বড় ও ব্যাপক কল্যাণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আর কল্যাণের বিনিময়ে ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিছু নীতিমালাও বেঁধে দিয়েছেন। অথচ আমরা ইসলামপন্থীদের দেখতে পাই, তারা এই শাইখদের ফতোয়াকে ব্যবহার করছে তাদের বেঁধে দেওয়া নীতিমালার কোনোরকম তোয়াক্কা ছাড়া। অবাধে তারা ছাড় দিয়ে যাচ্ছেন। কিসের বিনিময়ে? কিছু আনুষঙ্গিক, প্রাথমিক ও কল্পিত কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। যেগুলো কোনোভাবেই শাইখদের নির্ধারিত সে সার্বজনীন, বড় ও ব্যাপক কল্যাণ নয়।

তাই পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টদের আমরা জিজ্ঞেস করতেই পারি, সাংবিধানিক প্রেসিডেন্সিয়াল পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য আসলে কী?

এই প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি ওঠে, শুরুতে কী কী ছাড় আপনারা দিয়ে এসেছেন? অন্যভাষায় বললে, কোন কোন মাফসাদা কিংবা ক্ষতি আপনারা গ্রহণ করে নিয়েছেন?

এটি তো খুবই স্পষ্ট যে, বর্তমান পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টগণ ব্যাপক সমঝোতা ও ছাড় প্রদান করছেন। যেমন, গণতন্ত্রের গোলকধাঁধাকে স্বীকার করে নেওয়া, সে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, যা জনগণকে আইনপ্রণয়নের অধিকার দেয়, সেক্যুলারদের কাছে শরীয়াহকে বন্ধক দিয়ে বর্তমান পার্লামেন্টের প্রতি সমর্থন দেওয়া, শরীয়াহকে এক দফায় প্রয়োগ না করে অস্পষ্ট কিছু পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে প্রয়োগের ঘোষণা দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো সুস্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার বিষয়ে সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে।

এখন আসছে তৃতীয় প্রশ্ন: কী কী অর্জন করতে বা কোন কোন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে আপনারা এই ক্ষতিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন?

পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টগণ পূর্বে বর্ণিত ছাড় ও সমঝোতাগুলো খুব সহজ চোখে দেখেন, তাদের সমর্থক ও বিরোধীপক্ষকেও এগুলো মেনে নিতে বলেন। কারণ, তাদের দাবি অনুযায়ী, এই ছাড়ের বিনিময়ে তারা সার্বজনীন ও ব্যাপক কল্যাণ বাস্তবায়ন করবেন, নির্ধারিত লক্ষ্য তারা পূরণ করবেন। যেমন তারা বলেন, এই সমঝোতার বিনিময়ে আমাদের লক্ষ্য হলো শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা কিংবা উম্মাহর হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনা অথবা এই শাসনব্যবস্থাকে ইসলামসম্মত করা।

অথচ আমরা জানি যে, বড় বড় লক্ষ্য কখনোই সমঝোতা ও ছাড়ের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। কিন্তু এই ইসলামপন্থীদের দৃষ্টিতে, লক্ষ্য যত বড় হবে ছাড়ও ঠিক ততটা বড় দিতে হবে! এ-কারণেই বড় বড় সমঝোতা ও ছাড় দেওয়ার পরও তারা এগুলোকে সংগত ও তুলনামূলকভাবে কম মনে করেন। এখন তো এগুলো তাদের নিকট খুবই ছোটখাটো বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একটি মহান লক্ষ্যের দোহাই দিয়ে তারা এত বড় বড় ক্ষতিগুলোকে কম করে দেখতে শুরু করেছেন।

লক্ষ্য যেহেতু শরীয়াহ প্রয়োগ তাই মানবরচিত সংবিধানের ওপর শপথ গ্রহণ করার মধ্যে তারা কোনো সমস্যাই দেখতে পাচ্ছেন না! কত সময় অতিবাহিত হলো লক্ষ্য বাস্তবায়নের তো কোনো নাম-গন্ধই চোখে পড়ছে না। কিন্তু ছাড় প্রদানকে ছোটখাটো বিষয় মনে করার ক্ষতিকর প্রভাব এখনো বাকি থেকে গেল।

এখন সামনে এসে পড়ছে, চতুর্থ প্রশ্ন: প্রথম থেকেই যা অর্জন করার আপনারা আশা করেছিলেন তা কি এখনো বাকি আছে নাকি ধীরে ধীরে আপনাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসছে?

আমরা যখন দেখতে পেলাম, এই পার্লামেন্টপন্থীগণ সামরিক বাহিনীর ওপর কোনো রকম প্রভাব ফেলতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, এমনকি তারা নিজ দেশে সরকারিভাবে প্রভাব খাটিয়েও ইসলাম গ্রহণ করা কিছু বোনদের গির্জার নির্যাতন থেকে বের করে আনতে সক্ষম হননি[৮১] তখন নিশ্চয় খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা, উম্মাহর মর্যাদা ফিরিয়ে আনা, মুসলিমদের পশ্চিমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার মতো স্লোগানগুলো জনগণের নিকট তো বটেই, খোদ তাদের নিকটই ঠাট্টা ও কৌতুকপূর্ণ স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

এই কারণে বাস্তবতার দাবি হলো, যেন তারা স্বীকার করে নেন যে, ধীরে ধীরে অর্জনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আমরা পার্লামেন্টভিত্তিক ইসলামপন্থীদের নিকট আশা করব যেন তারা এখন থেকেই ঘোষণা করে দেন যে,

---

৮১. ২০০৯ থেকে ১৩ পর্যন্ত সময়টাতে মিসরে খ্রিষ্টান থেকে ইসলাম গ্রহণকারী অনেক বোনকে অপহরণ করে হত্যার অনেক রিপোর্ট এসেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার কিবতি গির্জায় টর্চার সেল ও জেলখানার সন্ধান পাওয়ার অনেক খবর চাউর হয়েছে। তাদেরই একজন কামিলিয়া শাহাতাহর ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি এক পাদরির স্ত্রী ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রাণভয়ে তিনি গির্জা ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তৎকালীন সরকার তাকে গির্জার হাতে আবার হস্তান্তর করে। তাদের মধ্য থেকেই এক বোনের জবানে টর্চারসেলের নির্যাতনের কাহিনি শুনুন: https://youtu.be/khcAwJ7-dlg.

আমাদের লক্ষ্য শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা নয়; বরং দা'ওয়াতের পরিমণ্ডলে স্বাধীনতার পরিধি আরও বিস্তৃত করা, সেক্যুলার ও নষ্ট সংগঠনগুলোর জন্যে রাজনীতির ময়দান খালি না রাখা, প্রশাসনিক ও আর্থিক খাতগুলো দুর্নীতিমুক্ত করা ও সামাজিক কিছু সংস্কার-কার্য পরিচালনা করা। ব্যস! এটুকুই।

আনুষঙ্গিক, প্রাথমিক ও কল্পিত এই অর্জন আমাদের পঞ্চম প্রশ্নের দিকে টেনে নিয়ে যায়: আপনারা কি ছাড় দেওয়ার পরিমাণ কমিয়ে ফেলছেন? যাতে অর্জন ও ছাড় দেওয়ার মাঝে ভারসাম্য তৈরী হয়?

আমরা পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টদের জিজ্ঞেস করি, আপনারা শুরু থেকেই মহান লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন বড় বড় ছাড় দিয়ে এসেছেন। অন্যভাবে বললে, বড় কল্যাণের লক্ষ্যে আপনারা বড় ক্ষতিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, এখন যেহেতু কল্যাণের পরিমাণ খুব কমে এসেছে আপনারা কি বিপরীতে ছাড় দেওয়ার পরিমণও কমিয়ে এনেছেন?

দুঃখের বিষয় আমরা এর উল্টোটাই দেখি। কল্যাণ ও অর্জনের এই মরিচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে তারা ছাড় দেওয়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্জন ও ছাড় দেওয়ার মাঝখানে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার এই বিষয়টিকে তারা গুরুত্বের সাথে দেখছেন না মূলত দুটি কারণে:

এক: বড় বড় ছাড় ও সমঝোতা তাদের দৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে ছোটখাটো বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আর একসময়ের তুলনামূলক সে ছোটখাটো বিষয় এখন সামগ্রিকভাবে ছোটখাটো বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

দুই: বর্তমান গণতান্ত্রিক পন্থায় অংশগ্রহণ করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন তারা এখনো দেখেন। তারা মনে করেন এখনো সুযোগ বাকি আছে। আর তাদের এই ধারণা মূলত সৃষ্টি হয় পূর্বোল্লেখিত লক্ষ্য নির্ণয়ে অস্পষ্টতা থেকে।

আরও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতসব ছাড় দেওয়ার পর যখন উনারা নিজেদের আংশিক ও প্রাথমিক লক্ষ্য পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন না তখন ছাড় ও সমঝোতার পরিমাণ তারা আরও বাড়িয়ে দেন! তাদের নিকট নিশ্চয় এতদিনে স্পষ্ট হওয়ার কথা যে, যতদিন তারা ইসলামের রং নিজেদের গায়ে মাখাবেন শত্রু ততদিন তাদেরকে এই শাসনব্যবস্থায় অনুপ্রবেশেরও সুযোগ দেবে না। তাই বলে কি তারা

এটা বলে বসবেন যে, আমরা তাহলে ইসলামী পরিচয় আরও কমিয়ে দিই, যাতে ক্ষমতায় আরোহণের পথ আরও মসৃণ হয়! মাধ্যমের জন্যে কি তারা মূল লক্ষ্যকেই বিক্রয় করে দেবেন? তাদের এই আচরণ তো গত পর্বে উল্লেখিত সে ব্যক্তির ন্যায়, যে এতিমদের সাহায্য করতে এসে নিজেই পরিচয় সংকটে পড়ে গিয়েছিল।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন:

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

'আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।'[৮২]

লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা ও বৈপরীত্য দেখতে পাই ঠিক তেমনি অর্জন ও ছাড়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের অস্পষ্টতা ও বৈপরীত্য চোখে পড়ে। পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টদের নিকট যখন তাদের বিপজ্জনক ছাড় ও সমঝোতার প্রতিবাদ জানানো হয় তখন তারা মহান উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে এগুলো সমর্থন করে যান। কিন্তু যখন তারা বুঝতে সক্ষম হন যে এই গণতান্ত্রিক পন্থায় কোনোভাবেই সেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয় তখন তারা আংশিক ও প্রাথমিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতাকে আঁকড়ে ধরেন।

সর্বশেষ ও ষষ্ঠ প্রশ্ন: বর্তমান পার্লামেন্টভিত্তিক রাজনীতিতে আপনারা যারা ইসলামপন্থী আছেন তারা নিজেদের শক্তিশালী নাকি দুর্বল গণ্য করেন?

এ ক্ষেত্রেও উনাদের অবস্থান বৈপরীত্যপূর্ণ। যখন তারা পার্লামেন্ট পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলেন তখন তাদের ভাষা হয় শক্তিশালী ও সক্ষম ব্যক্তিদের ভাষা। তখন তারা সংবিধানে বিপ্লব সৃষ্টির কথা বলেন, সরকারি মন্ত্রণালয়গুলোকে ইসলামীকরণ ও সামরিক বাহিনীর নষ্ট নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা বলেন। এগুলো সবগুলো তো সক্ষম ব্যক্তিদের ভাষা। কিন্তু যখন তাদের আজগুবি সব ঘোষণা ও লাগাতার ছাড় দেওয়ার কারণে তিরস্কার করা হয় তখন উনারা নিজেদের দুর্বলতার দোহাই দেন, অপারগতার কথা জানান দেন। আমাদের উচিত ইসলামপন্থী হিসেবে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে কিনা তা নির্ধারিত করা। আমরা সামর্থ্যবান নাকি দুর্বল? যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের ভূমিকা, কর্তব্য ও মাধ্যম ভিন্ন আর যারা দুর্বল তাদেরও ভূমিকা, কর্তব্য ও মাধ্যম ভিন্ন।

---

৮২. সূরা বাকারাহ: ১৬৮।

সামর্থ্য ও দুর্বলতার এই দুই অবস্থাকে মিলিয়ে ফেলা কখনোই উচিত নয়। এও উচিত নয় যে, আপনি পার্লামেন্ট সিস্টেমে ঢুকে পড়লেন এই ভেবে যে সেখানে আপনি রীতিমতো বিপ্লব সৃষ্টি করবেন। কিন্তু প্রবেশের পর জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আপনি বৈধতা দিয়ে দিলেন, তাদের এজেন্ডা নিজেই বাস্তবায়ন করতে লাগলেন, নিজের আত্মপরিচয় হারিয়ে তাদের সাথে মিশে গেলেন এরপর দুর্বলতার দোহাই দিয়ে এসব কিছু বৈধ করে নিলেন!

এখন তো দিবালোকের ন্যায় এ কথা স্পষ্ট যে, বর্তমান ইসলামপন্থার এই যে করুণ দশা তা মূলত লক্ষ্যহীনতা ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় অস্পষ্টতা থেকে সৃষ্ট। এর শুরুটা হয় অকাট্য ও অপরিবর্তনশীল বিষয়গুলোতে ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে। তারা নিজেদের এই অবস্থানের সমর্থনে অগোছালো কিছু দলিলও পেশ করে। সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

এই অল্প যা কথা বললাম, আশাকরি এই কথাগুলো আমার গণতন্ত্রপন্থী ভাইয়েরা আমলে নেবেন। সেই সাথে যেন তারা আল্লাহর এই বাণীর দিকে গভীর দৃষ্টি দেন:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾

'নিশ্চিতভাবে এটি আমার একমাত্র সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে পা দিয়ো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'[৮৩]

হযরত আবু বকর ﵁ এর একটি বক্তব্য বুখারীতে এসেছে। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল ﷺ করেছেন এমন কাজ আমি না করে ছেড়ে দেব তা হতে পারে না। কারণ, তার করা কোনো কাজ ছেড়ে দিতে গিয়ে আমার ভয় হয়, না জানি আমি সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই![৮৪]

এই পর্বের সারকথা হলো, কিছু কল্পিত অর্জনের বিনিময়ে ইসলামের অকাট্য বিষয়গুলোতেও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা বর্তমান ইসলামপন্থাকে বড় ধরনের ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। তাই ইসলামপন্থীদের উচিত, নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ও এটি বুঝতে পারা যে, লক্ষ্য কখনো ছাড়ের মাধ্যমে অর্জিত হয় না।

---

৮৩. সূরা আনআম: ১৫৩।

৮৪. সহীহ বুখারী: ৪২৪০।

আমার কথাগুলো তোমরা একদিন স্মরণ করবে

গত পর্বে আমরা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেছিলাম, যেসব ইসলামপন্থী গণতন্ত্রের গোলকধাঁধায় নিজেদের প্রবেশ করিয়েছেন তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য আসলে কী? শরীয়াহ প্রয়োগ নাকি সামান্য কিছু সংস্কার?

লক্ষ্য যদি হয় শরীয়াহ প্রয়োগ, তাহলে কখনোই আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের এই অনুমতি দেননি যে, তারা মহান লক্ষ্য পূরণে ছাড় ও সমঝোতার পথ বেছে নিয়ে এমন রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে, যা আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের জন্যেও সাব্যস্ত করে।

মহান আল্লাহ নিজেই আমাদের নিকট শত্রুদের আচরণ চিহ্নিত করে দিয়ে বলেছেন:

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾

'তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে যদি তারা সক্ষম হয় তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে।'[৮৫]

ইহুদি, খ্রিষ্টান ও শরীয়াহর শত্রুগণ তাদের দলে ভিড়ে যাওয়া ছাড়া কখনোই কারও ওপর সন্তুষ্ট হবে না। তারা দিনে-রাতে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, তাদের আইন ও সংবিধান কঠোর পরিশ্রম করে তৈরি করছে, যাতে এমন কোনো ফাঁকফোকর থেকে না যায়, যাকে কাজে লাগিয়ে কেউ শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে পারে।

বর্তমান ইসলামপন্থীদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো, তারা এই বাস্তবতাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। তারা মনে করছেন যে, তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলে তারা তাদের ষড়যন্ত্র থামিয়ে দেবে। শত্রুদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির জালে ধোঁকা খেয়ে আমাদের এই ভাইয়েরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, এই পন্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে শরীয়াহ প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে!

এ পর্যায়ে সাইয়েদ কুতুব শহীদ ﷺ এর একটি বক্তব্য তুলে ধরা আমি খুবই প্রাসঙ্গিক মনে করছি, তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কথাগুলো বলেছিলেন:

---

৮৫. সূরা বাকারা: ২১৭।

মহান আল্লাহ বলেন;

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾

'কাফেররা রাসূলদের বলেছিল: হয় তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে নাহয় আমরা তোমাদের দেশছাড়া করব। তখন তাদের নিকট তাদের পালনকর্তা এই বার্তা প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদের অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। তাদের পর তোমাদেরই সে দেশে স্থান দেব। এটি সে ব্যক্তির জন্যে, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।'[৮৬]

এই আয়াতে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যকার চলমান যুদ্ধের বাস্তবতা স্পষ্ট করা হয়েছে। নিশ্চয় আগাগোড়া জাহেলিয়্যাতে ভরপুর একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনো মুসলিমকে নিজ স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার সুযোগ দেবে না। এই সিস্টেমের ভেতর কাজ করতে হলে একজন মুসলিমকে অবশ্যই জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার সেবা করে যেতে হবে, তার হিসেব অনুযায়ী চলতে হবে, জাহেলিয়াতকে মজবুত করতে হবে। যারা এই ধারণা করে বসে আছেন যে, তারা জাহেলী সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে দীনের কাজ করবেন, এই অঙ্গের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে সবকিছু পাল্টে দেবেন তারা আসলে এই সিস্টেমের স্বভাব-প্রকৃতি এখনো আঁচ করতে সক্ষম হননি। কারণ, বাস্তবতা হলো জাহেলিয়াতের এই প্রকৃতি তার ভেতর অবস্থান করা প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ খেয়ালখুশি ও দর্শন অনুযায়ী চলতে বাধ্য করে। এই কারণে মু'মিনগণ কখনোই জাহেলী সিস্টেমে অংশগ্রহণ করেন না। তারা একবাক্যে একে প্রত্যাখ্যান করেন।

আয়াতের শেষদিকেই মহান আল্লাহ মু'মিনদের মাঝে ও দাওয়াতের পথে বাধাদানকারী জালিমদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়ে বলেছেন:

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾

---

৮৬. সূরা ইবরাহীম: ১৩-১৪।

‘তাদের নিকট তাদের পালনকর্তা বার্তা প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদের অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। তাদের পর তোমাদেরই সে দেশে স্থান দেব। এটি সে ব্যক্তির জন্যে, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।’[৮৭]

আমাদের এটি বুঝতে পারা উচিত যে, আল্লাহ জালিমদের বিরুদ্ধে মু’মিনদের বিজয় তখনই একমাত্র দেবেন যখন তারা জালিমের সাথে আকীদার ভিত্তিতে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং সে ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পর এই সাহায্যের আশা করা এককথায় বোকামি।[৮৮]

অতএব ইমাম মালেক ﵀ যেভাবে বলেছেন আমাদেরও সেভাবেই বলতে হবে: “এই উম্মাহর পরবর্তীদের অবস্থা কখনোই সংশোধন হবে না পূর্ববর্তীদের পথ অবলম্বন করা ছাড়া।”[৮৯]

হযরত উমর ﵁ বলেছিলেন: “আল্লাহ আমাদের যে পথে সম্মানিত করেছেন সে পথ ছাড়া ভিন্ন পথে যদি আমরা সম্মান তালাশ করি আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।”[৯০]

মনে রাখা প্রয়োজন এই উম্মাহর পূর্ববর্তীগণ ছাড় ও সমঝোতার মাধ্যমে সম্মান অর্জন করেননি; বরং আল্লাহ তাদের সম্মান দিয়েছিলেন তাদের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের কারণে।

পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আমদানি করেনি; বরং ইসলামের বিকল্প হিসেবেই তারা একে এনেছে। এই কারণে এটি এমন একটি গণতন্ত্র, যাকে ব্যবহার করে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় আরোহণের কোনো সুযোগ নেই; বরঞ্চ এই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যই হলো ইসলামপন্থীগণ যাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে না পান সে ব্যবস্থা করা। আমেরিকান বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও তাদের এ-দেশীয় চামচাগুলো বারবার ঘোষণা দিয়ে এসেছে যে, গণতন্ত্র কখনোই তার শত্রুদের গ্রহণ করবে না।

---

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. ফী যিলালিল কুরআন: ২০৯২/৪।

৮৯. ইকতিদাউস সিরাত: ৩৬৭। শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ﵀।

৯০. হাকেম: ১৩০/১।

এই গণতন্ত্র ইসলামপন্থীদের কখনোই ক্ষমতাসীন হতে দেবে না। যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে দেয়ও তার কাছ থেকে 'ইসলামপন্থী' পরিচয় সে ছিনিয়ে নেবে। যেভাবে আগের গল্পটিতে আমাদের চরিত্রটি এতিমদের কাপড় পরাতে গিয়ে নিজেই উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। যদি সামান্য কিছু ইসলামী পরিচয় লোকটির বাকি থেকেও যায়, গণতন্ত্রের হর্তাকর্তারা তার ওপর হামলে পড়বে, গণতন্ত্রের খাতা থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হবে।

এই সময়টাতে এসে আমরা ইসলামপন্থীদের নিকট আল্লাহর রাসূলের ﷺ একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

'তোমাদের মধ্যে নবুওয়াতী শাসনব্যবস্থা থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওয়াতের নিয়মে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে, এরপর উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তা থাকবে, এরপর উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পন্থায় আবার খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে।'[৯১]

হাদিসটি লক্ষ করুন, অত্যাচারী রাজাদের পর ইসলামী গণতন্ত্র নামের কিছু আসবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেননি; বরং বলেছেন নবুওয়াতের পন্থায় পুনর্বার খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা।

গণতন্ত্রের পন্থা কখনোই সঠিক নয়। এটিকে সহজ ও ফুলে বেষ্টিত পথ মনে করেন অনেকেই। কারণ, এখানে ত্যাগের পরিমাণ খুবই কম। তাদের উদাহরণ অনেকটা সে ব্যক্তির মতো, যে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে চায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিপরীতে সে আরেকটি রাস্তা দেখতে পেল যেটি গোলাপ-বেষ্টিত, সেখানে সঙ্গ দেওয়ার মানুষও অনেক। কিন্তু এই রাস্তাটির

---

৯১. তাখরীজু মিশকাতিল মাসাবিহ: ৫৩০৬।

দোষ একটাই যে, এই পথে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানো অসম্ভব; বরঞ্চ এই পথের গন্তব্য পাহাড়ের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে যায়, যার কারণে হাঁটা শুরু করলে পাহাড় থেকে দূরত্ব আরও বেড়ে যাবে। তো এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিল! পথ সহজ ও দ্রুত হওয়ার পরও এই রাস্তায় চলার মাঝে কী লাভ রয়েছে যেখানে এই রাস্তার গন্তব্য ভিন্ন!

আমরা পার্লামেন্ট-নির্ভর ইসলামপন্থীদের বারবার প্রশ্ন করি: আপনাদের নিকট ইতিহাসের এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি আছে যেখানে ছাড় ও সমঝোতার মাধ্যমে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত রচিত হয়েছে কিংবা এর মাধ্যমে শরীয়াহ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে? পুরো ইতিহাস ঘেঁটে আমাদের শুধু একটি উদাহরণ দিন। এ ছাড়া বাস্তবতা ও পরিস্থিতিও আমাদের এই কথাগুলোর সাক্ষ্য দেয়। ধীরে ধীরে দিনের পর দিন এই বাস্তবতাই প্রকাশ পাবে যে, মানবরচিত সংবিধান, পার্লামেন্ট ও ছাড়ের পথ অবলম্বন করে কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; বরঞ্চ এই রাস্তায় চললে দীন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আরও বেশি জটিল রূপ ধারণ করবে।

﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾

আমি তোমাদের যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে।[১২]

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً
ويأتيك بالأخبار من لم يزوّدِ

"সময় তোমার নিকট তা প্রকাশ করবে যে ব্যাপারে তুমি অজ্ঞ ছিলে,
এমন সংবাদ তোমায় জানিয়ে দেবে যা শুনতে তুমি অপ্রস্তুত ছিলে।"[১৩]

এ-কারণে পার্লামেন্ট-নির্ভর ইসলামপন্থীদের আমরা বলি: নিজেদের সাথে স্পষ্টভাষী হোন। প্রকাশ্যে বলুন যে: আমাদের উদ্দেশ্য হলো কিছু ছোটখাটো সংস্কারকার্য পরিচালনা করা ও ক্ষতির পরিমাণ কমানো। সে সময় আমরা যথাযথভাবে জবাব

---

১২. সূরা গাফির: ৪৪।

১৩. হযরত আয়েশার ্ বর্ণনামতে, কবিতা আওড়ানোর স্বভাব রাসূলের ্ না থাকা সত্ত্বেও এই কবিতাটি তিনি সামান্য পরিবর্তন করে আওড়াতেন। দেখুন মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬/৬। এটি মূলত তুরফা ইবনুল আব্দের কবিতা।

দিতে পারব, বলতে পারব যে: জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে এর ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামপন্থীদের নয়; বরঞ্চ ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই প্রকল্প এসব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারপরও আপনাদের এই সংস্কারকর্ম যদি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাড় দেওয়া ছাড়াই হতো কিংবা ছাড়ের পরিণতিতে সৃষ্ট দুর্ভাগ্যজনক ক্ষতি থেকে মুক্ত হতো তাহলে নাহয় আমরা বলতে পারতাম, যাক! কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রবেশের পর সেটিকে বৈধতা দান, এরপর প্রাথমিক কিছু গুরুত্বহীন অর্জন, আবার এসব কিছু ইসলামের নাম ভাঙিয়ে করা এগুলো নিশ্চয় কখনো সমর্থনযোগ্য নয়। আর এহেন কর্মকাণ্ড ইসলামকে ছোট করা ও উপহাস করার নামান্তর।

জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার উদাহরণ হলো ভাঙনের প্রান্তে অবস্থিত পতনোন্মুখ দালানের মতো। আমরা যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত তাদের কর্তব্য হলো জনগণকে সতর্ক করে বলা: এই দালান অচিরেই ধ্বংস হবে, তার আগেই আপনারা এখান থেকে সরে পড়ুন। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন না, এর সাথে নিজেদের জড়াবেন না।

কিন্তু নিজেরাই সে দালানে প্রবেশ করে ছোটখাটো সংস্কারকাজ চালিয়ে সেখানকার ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করা নিঃসন্দেহে ধোঁকা। কারণ, যে দালান দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অচিরেই যার পতন ঘটবে এমন দালান সংস্কারের তো কোনো অর্থ দাড়ায় না। যে দালান ধ্বংস হবেই তার মেরামত করা সময় অপচয় ছাড়া আর কী হতে পারে? ভঙ্গুর যে দালান মেরামতের আমরা কসরত চালিয়ে যাচ্ছি অচিরেই তা আমাদেরসহ নিয়ে ইতিহাসের অন্ধকার গর্তে হারিয়ে যাবে। তখন জনগণের সামনে দেখানোর মতো মুখ আর আমাদের বাকি থাকবে না।

কিন্তু শুরু থেকেই যদি আমরা জনগণকে এই দালান সম্পর্কে সতর্ক করে যেতাম, যদি তাদের বলতাম: প্রিয় দেশবাসী, এই জাহেলী স্থাপনা অচিরেই ধ্বংস হবে। অতএব এখান থেকে বেরিয়ে আসুন। চলুন আমরা নতুন দালান নির্মাণ করি, যার ভিত্তি হবে মজবুত।

তখন জাহেলিয়াতের ভবনটি ধসে পড়ার সাথে সাথে সকলেই আমাদের বিশ্বাস করা শুরু করবে। যারা আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে থাকাত, যারা বিরোধিতা করত,

যারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল তারা সকলেই আমাদের সাথে এসে যোগ দেবে। তাদের আস্থা আমাদের ওপর জোরদার হবে। জনগণের চাহিদা আমাদের কেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠবে। আমাদের দায়িত্ব তো এটিই। জাহেলী ব্যবস্থার দুর্বলতা ঢাকা কিংবা তাদের স্থায়িত্বকে দীর্ঘায়িত করার দায়িত্ব তো আমাদের নয়।

অতএব ইসলামপন্থীগণ যখনই নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী পরিচয়কে সামনে এনে রাখবেন তখন ইসলামের বেঁধে দেওয়া উদ্দেশ্যই তাদের উদ্দেশ্যে পরিণত হতে হবে, ইসলামের সঠিক পরিচয়েই তাদের পরিচিত হতে হবে।

এই পর্বের সারকথা হলো: বিভিন্ন ছাড়, সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক জটিলতায় প্রবেশ করে কোনো ইসলামপন্থীর যদি শরীয়াহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এই উদ্দেশ্য কখনোই এই পন্থায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয়, জোড়াতালির মাধ্যমে ছোটখাটো কিছু সংস্কার করা তাহলে মনে রাখা উচিত ইসলাম তাদের এই উদ্দেশ্য থেকে অনেক উর্ধ্বে।

গণতন্ত্রের দাসত্ব ও পতনের সূচনা

গত পর্বগুলোতে আমরা বলেছিলাম যে, পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টগণ কিছু কল্পিত অর্জনের বিনিময়ে ব্যাপক ছাড় দিয়ে ফেলেছেন। তো সে ছাড়গুলো মূলত কী?

লক্ষ করুন, প্রথম ও সবচেয়ে বিপজ্জনক ছাড়ই হলো, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা। যে পদ্ধতিতে আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের হাতে অর্পণ করা হয়। এই কারণে আমরা যখন বলি পার্লামেন্টপন্থীগণ ছাড় দিয়েছেন তখন মূলত আমাদের উদ্দেশ্যে থাকে যে, মোটাদাগে তাদের প্রধান ছাড়ই হলো পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করা।

পার্লামেন্ট ধারণায় জনগণ এমন কিছু প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, যারা তাদের হয়ে আইন প্রণয়ন করবে। প্রশাসনিক যে সমস্ত খাতে আল্লাহ আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, পার্লামেন্ট শুধু সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন সেগুলোও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমতির প্রয়োজন পড়বে।

এককথায় গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো, জনগণ নিজেদের জন্যে যে আইনই প্রণয়ন করতে চাইবেন তারা তা প্রণয়ন করার অধিকার রাখেন। এই কারণে গণতন্ত্র ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। কারণ, ইসলাম হলো, আল্লাহর দেওয়া আইনের সামনে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করার নাম। এখানে আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে একমাত্র আল্লাহর। আর এই কথাটি স্বীকার করে নেওয়া তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর একটি প্রকার। তিনি যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, আদেশ মানতে হবে তাঁরই।

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

'সৃষ্টি তাঁর, আদেশও তাঁর।'[৯৪]

আর তাঁর এই প্রণীত বিধানসমূহের আনুগত্য করা হলো, তাওহীদুল ওলূহিয়্যাহর[৯৫] একটি প্রকার। এই তাওহীদের দাবি হলো, ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করা। কিন্তু ইবাদত কী? ইবাদত হলো, আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা। অথচ গণতন্ত্রে সবকিছুই উলটো। এখানে আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে শুধুই মানুষের, আবার আনুগত্যও করতে হবে তাদের তৈরি আইনের। এখন আসুন এই দুই ধর্মের মাঝে কিছু তুলনা দেখে আসি:

ইসলাম ধর্ম বলে:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করবে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিপতিত।'[৯৬]

---

৯৪. সূরা আ'রাফ: ৫৪।

৯৫. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলা হয়: আল্লাহর যাবতীয় কর্মে তাঁকে এক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। যেমন: সৃষ্টি করা, মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ করা, রিযিক দেয়া, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া ইত্যাদি সব কাজে তিনি এক। আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ হলো: ইবাদত করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা। শুধু তাঁরই ইবাদত করা। একজন মুসলিমের মাঝে উভয় তাওহীদই পাওয়া যেতে হবে। যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি একাই, তাই ইবাদত করা হবে শুধু তাঁকেই। মক্কার মুশরিকরা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করলেও তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তারা স্বীকার করত না। আকীদার জরুরি বিষয়ে জানতে অবশ্যপাঠ্য হলো, শাইখ আব্দুল মালিক হাফি. রচিত 'ঈমান সবার আগে' বইটি।

৯৬. সূরা আহযাব: ৩৬।

গণতন্ত্র ধর্ম বলে:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কিছুর আদেশ করলে সে বিষয়টি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হবে। আর এই আদেশ গ্রহণ করা কিংবা বর্জন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে। পার্লামেন্ট যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে তবু তার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে; কেননা, তা অধিকাংশের মত।

ইসলাম ধর্ম বলে:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

'যখন ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে মু'মিনদের আহ্বান করা হয়, তখন তারা এ কথাই শুধু বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম।'[৯৭]

গণতন্ত্র ধর্ম বলে:

যখন ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে গণতন্ত্রপন্থীদের আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা আল্লাহর আদেশ পার্লামেন্টে উত্থাপন করব। পার্লামেন্ট অনুমতি দিলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ইসলাম ধর্ম বলে:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ! সে লোক ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ক্ষেত্রে আপনার নিকট শাসনভার ন্যস্ত করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের অন্তরে যেন কোনোরকম সংকীর্ণতা না পায় এবং তা যেন সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়।'[৯৮]

---

৯৭. সূরা নূর: ৫১।
৯৮. সূরা নিসা: ৬৫।

গণতন্ত্র ধর্ম বলে:

অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! সে লোক গণতন্ত্রের প্রতি ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নিকট শাসনভার ন্যস্ত করে। অতঃপর তাদের অন্তরে গণতন্ত্রের সুযোগ কাজে লাগিয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কোনোরকম নিয়ত যেন না থাকে বরং সে যেন গণতন্ত্রের তন্ত্রমন্ত্রকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়।

ইসলাম ধর্ম বলে:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

'শাসন তো একমাত্র আল্লাহর।'[৯৯]

গণতন্ত্র ধর্ম বলে:

শাসন একমাত্র পার্লামেন্টের। এমনকি তার শাসন চলবে আল্লাহর শাসনের ওপর।

ইসলামের সংজ্ঞার দিকে লক্ষ করলেও বোঝা যায়, গণতন্ত্র ইসলামবিরোধী। ইসলাম বলা হয়: আল্লাহর হুকুমের সামনে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা। আর আল্লাহর আদেশ হিসেবে তাঁর আইনকেই বাস্তবায়ন করা।

অপরদিকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হলো: সবকিছুর ওপর পার্লামেন্টকে শাসক নিযুক্ত করা, এমনকি শরীয়াহর ওপরও। এই ব্যবস্থায় যদি শরীয়াহসম্মত কোনো আইন প্রয়োগও হয়ে যায় তাহলে এটি আল্লাহর বিধান হিসেবে প্রয়োগ হবে না কিংবা তার আদেশ মান্য করতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন অর্থও দেবে না; বরং বলা হবে, পার্লামেন্ট অনুমতি দিয়েছে বিধায় প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। তখন আল্লাহর হুকুমের সামনে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের অর্থ কখনো বাস্তবায়িত হয় না।

আমার ভাইয়েরা, আরেকটি বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন, পশ্চিমারা মুসলিম-বিশ্বে গণতন্ত্র আমদানি করেছে শুধু শরীয়াহ প্রয়োগের দিকে ধাপে ধাপে দা'ওয়াত দেওয়ার পথকে বন্ধ করার লক্ষ্যে। যদি এই লক্ষ্য এমনিতেই হাসিল হয়ে যায় দেখবেন তারাই গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে স্বৈরশাসনকে সমর্থন দিয়ে দেয়। তখন

---

৯৯. সূরা আনআম: ৫৭।

তারা জনগণের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও সম্মানের তোয়াক্কা না করে স্বৈরাচারের এজেন্ডা নিজেরাই বাস্তবায়ন করতে শুরু করে।[১০০]

আপনি এমন অনেক মুসলিম রাষ্ট্র দেখতে পাবেন, যারা স্বৈরশাসকদের নির্যাতনের জাঁতাকলে বহুকাল ধরে পিষ্ট হচ্ছে। এই স্বৈরাচারীরা কিন্তু নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকার সমর্থনকে পুঁজি করে। যদি কখনো সে দেশগুলোতে স্বৈরশাসনের পতন ঘটে, জনগণের পক্ষ থেকে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে দেখবেন পশ্চিমা দেশগুলো সেখানকার রাজনীতির মঞ্চে দ্রুত নিজেদের উপস্থিতি জানান দেবে, তাদের দেশীয় চরেরা গণতন্ত্রের দাবি উচ্চকিত করতে থাকবে। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অনেক ইসলামপন্থী তাদের সাথে যোগ দেবেন। তখন দেখতে পাবেন ধারাবাহিকভাবে আমেরিকা নিজেই নির্বাচনের ডামাডোল বাজাবে, নিজেই আবার নির্বাচনের পর এর স্বচ্ছতার প্রশংসা করবে, জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাবে! অথচ এই ইচ্ছাকেই দমন করতে একসময় আমেরিকা স্বৈরাচারীদের ঘুষ দিত, তাদের প্রতি সমর্থন জানাত। যা বিস্তারিতভাবে নোয়াম চমস্কি তার 'What Uncle Sam Really Wants' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১০১]

তো এতসব কূটকর্ম দ্বারা জনগণের কল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং শরীয়াহ প্রয়োগের ডাককে নিশ্চিহ্ন করাই মূল টার্গেট। যখন এই উদ্দেশ্য ষোলোকলায় পূর্ণ হবে, গণতন্ত্র ও এর শিরকি নীতিতে প্রতারিত ইসলামপন্থী ও জনগণের ওপর থেকে যখন তারা তাদের স্বীকৃতি উঠিয়ে নেবে, যখন ধীরে ধীরে এদের তারা শরীয়াহবিদ্বেষী অবস্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে তখন দেখতে পাবেন খোদ পশ্চিমই গণতন্ত্র ফেলে সেনাসমর্থিত সরকার কিংবা স্বৈরশাসকদের সমর্থন দেবে, যারা জনগণকে বিভিন্নভাবে

---

১০০. আরব বিশ্বের প্রায় সব সেনাঅভ্যুত্থানকে মদদ দেয় গণতন্ত্রের ধোঁয়া তোলা খোদ পশ্চিমারাই। ২০১৩ এর জুলাইয়ে মিসরের একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে অপসারণ করে স্বৈরশাসক সিসি যখন ক্ষমতায় তখন আমেরিকা তাকে সমর্থন দেয়। এরপর ২০১৬ এর জুলাইয়ে তুরস্কে এরদোয়ানের বিরুদ্ধে পরিচালিত সেনাঅভ্যুত্থানেও তারা চুপ করে থাকে। যখন সেনাঅভ্যুত্থান ব্যর্থ প্রায় নিশ্চিত তারপর তারা এরদোয়ানকে পরিপূর্ণ সমর্থনের কথা জানায়। বিস্তারিত জানতে দেখুন টিআরটির এই রিপোর্টটি: https://www.trtarabi.com/article/27155.

১০১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে আমেরিকার পলিসি কেমন? সে সমস্ত দেশগুলোতে তারা গণতন্ত্রের নামে আসলে কী চাপিয়ে দিয়ে আসে? মোটকথা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে বইটি অবশ্যপাঠ্য। http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/WhatUncleSamWants.html

নির্যাতন করবে, তাদের ইচ্ছার অবমূল্যায়ন করবে, দেশ ও জনগণকে পশ্চিমাদের স্বার্থে নিয়োজিত রাখবে। তো এই সময় জনগণের নিকট গণতন্ত্র গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে। অথচ এর কারণেই ইতিপূর্বে তারা শরীয়াহকে ছেড়ে দিয়েছিল। না পারবে একে ফেলতে, আবার না পারবে এর স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে।

বিভিন্ন আরব দেশে পশ্চিমারা যেভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছিল এখানে সেভাবে না করলেও অন্ততপক্ষে তারা চেষ্টা করবে গণতন্ত্রের বিকৃত একটি রূপকে ক্ষমতায় আসীন করাতে। যেখানে সরাসরি বলা হবে, আমাদের শরীয়াহ প্রয়োগের কোনো ধরনের ইচ্ছা নেই অথবা বলবে, আমাদের গণতান্ত্রিক এই পন্থায় শরীয়াহর কোনো স্থান নেই।

এই কারণে আমরা যারা গণতন্ত্রের বিরোধিতা করি, আমাদের উচিত বক্তব্য প্রদানের সময় সতর্ক হওয়া। গণমাধ্যম ও দেশীয় পশ্চিমা চরেরা খুব সম্ভব এই বক্তব্যগুলো বিকৃত করতে উঠেপড়ে লাগবে। তারা জনগণকে বোঝাবে: এই ইসলামপন্থীরা আপনাদের ওপর শরীয়াহ চাপিয়ে দিতে চায়, তারা কখনোই আপনাদের স্বাধীনতা চায় না, তারা আপনাদের ইচ্ছার মূল্যায়ন করবে না। এই লোকগুলো স্বৈরশাসনের আরেকটি রূপ চালু করতে চায়, যা থেকে আপনারা সবে মুক্তি পেয়েছেন।" এককথায় আমাদের জনগণ ও স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে তারা উপস্থাপন করবে।

তাই জনগণকে আমাদের এটি বোঝাতে হবে যে, শরীয়াহ প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর নিঃশর্ত দাসত্ব বাস্তবায়ন করা ছাড়া স্বাধীনতা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতি এই দাসত্বই আপনাকে পশ্চিমের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

আমরা শরীয়াহর প্রচারক। আমরাই স্বাধীনতা, সম্মান ও নেতৃত্বের প্রচারক। আমরাই প্রচার করি, মুসলিম উম্মাহ তার শরীয়াহ দ্বারা পুরো পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾

'আমি তোমাদের নিকট একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; যাতে রয়েছে তোমাদের আলোচনা।'[১০২]

১০২. সূরা আম্বিয়া: ১০।

নির্যাতন করবে, তাদের ইচ্ছার অবমূল্যায়ন করবে, দেশ ও জনগণকে পশ্চিমাদের স্বার্থে নিয়োজিত রাখবে। তো এই সময় জনগণের নিকট গণতন্ত্র গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে। অথচ এর কারণেই ইতিপূর্বে তারা শরীয়াহকে ছেড়ে দিয়েছিল। না পারবে একে ফেলতে, আবার না পারবে এর স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে।

বিভিন্ন আরব দেশে পশ্চিমারা যেভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছিল এখানে সেভাবে না করলেও অন্তত পক্ষে তারা চেষ্টা করবে গণতন্ত্রের বিকৃত একটি রূপকে ক্ষমতায় আসীন করাতে। যেখানে সরাসরি বলা হবে, আমাদের শরীয়াহ প্রয়োগের কোনো ধরনের ইচ্ছা নেই অথবা বলবে, আমাদের গণতান্ত্রিক এই পন্থায় শরীয়াহর কোনো স্থান নেই।

এই কারণে আমরা যারা গণতন্ত্রের বিরোধিতা করি, আমাদের উচিত বক্তব্য প্রদানের সময় সতর্ক হওয়া। গণমাধ্যম ও দেশীয় পশ্চিমা চরেরা খুব সম্ভব এই বক্তব্যগুলো বিকৃত করতে উঠেপড়ে লাগবে। তারা জনগণকে বোঝাবে: এই ইসলামপন্থীরা আপনাদের ওপর শরীয়াহ চাপিয়ে দিতে চায়, তারা কখনোই আপনাদের স্বাধীনতা চায় না, তারা আপনাদের ইচ্ছার মূল্যায়ন করবে না। এই লোকগুলো স্বৈরশাসনের আরেকটি রূপ চালু করতে চায়, যা থেকে আপনারা সবে মুক্তি পেয়েছেন।" এককথায় আমাদের জনগণ ও স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে তারা উপস্থাপন করবে।

তাই জনগণকে আমাদের এটি বোঝাতে হবে যে, শরীয়াহ প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর নিঃশর্ত দাসত্ব বাস্তবায়ন করা ছাড়া স্বাধীনতা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতি এই দাসত্বই আপনাকে পশ্চিমের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

আমরা শরীয়াহর প্রচারক। আমরাই স্বাধীনতা, সম্মান ও নেতৃত্বের প্রচারক। আমরাই প্রচার করি, মুসলিম উম্মাহ তার শরীয়াহ দ্বারা পুরো পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾

'আমি তোমাদের নিকট একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; যাতে রয়েছে তোমাদের আলোচনা।'[১০২]

---

১০২. সূরা আম্বিয়া: ১০।

মুফাসসিরগণ বলেন, অর্থাৎ যে কিতাবে রয়েছে অন্যান্য জাতির ওপর তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্র হলো গায়রুল্লাহর নিকৃষ্ট দাসত্ব। বাহ্যিকভাবে দেখলে যদিও এটি বান্দার প্রতি বান্দার দাসত্ব। কিন্তু গণতন্ত্র মূলত পশ্চিমের দাসত্ব। এটি পশ্চিমের সুপরিকল্পিত মতবাদ, যার মাধ্যমে তারা তামাম ইসলামী বিশ্ব কব্জায় নিয়ে আসতে চায়।

একবার হযরত আদী ইবনে হাতেম রাসূলের ﷺ দরবারে আসলেন। পূর্বে তিনি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। আসার পর রাসূলকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও বৈরাগীদের তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-পুত্র ঈসাকেও।'[১০৩]

তিনি বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা তো এদের ইবাদত করে না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন: হ্যাঁ। তবে এই পণ্ডিতেরা হালালকে হারাম করত, হারামকে হালাল করত, আর লোকেরা এই ক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করত। আর এটাই হলো ইবাদত।[১০৪]

অধিকাংশ মুসলিমের অন্তরে এখন এই ধারণা বদ্ধমূল যে, গণতন্ত্র হলো স্বাধীনতার অপর নাম। এই ধারণা সম্পূর্ণ বাস্তবতা-বিবর্জিত; বরঞ্চ এই গণতন্ত্র মূলত দাসত্ব। এক স্বৈরশাসকের দাসত্বের বদলে এটি মানুষকে একদল আইনপ্রণেতা ও পশ্চিমাদের দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখে। পশ্চিম কখনো চায় না যে, মুসলিম আল্লাহর দাসত্বের পরিচয়ে গর্ববোধ করুক।

আফসোস! ইসলামপন্থীগণ—আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিন—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে মূলত এই দাসত্বকেই গ্রহণ করে নেন, যা বাহ্যিকভাবে মানুষের দাসত্ব দেখা গেলেও, বাস্তবে পশ্চিমের দাসত্ব।

---

১০৩. সূরা তাওবাহ: ৩১।
১০৪. তিরমিজি: ৩০৯৫।

উদাহরণস্বরূপ আমরা মিসরের পরিস্থিতিকে সামনে আনতে পারি। মোবারক সরকারের পতন ঘটার আগ পর্যন্ত সময়টাতে অনেক ইসলামপন্থী দল পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করাকে হারাম বলে মেনে নিতেন। কারণ, এই ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের অধিকার জনগণের জন্যে সাব্যস্ত করা হয় আর মানবরচিত সংবিধানকে মূলভিত্তি বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আরব বসন্তের পর তারা সাংবিধানিক আইনশূন্য একটি জরুরি অবস্থা ধার্য করলেন। ইতিপূর্বে যে ছাড়গুলো দিতে হবে বিধায় তারা পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেননি, ভাবলেন সে ছাড়গুলো এখন আর দিতে হবে না। তখন তারা নিচের পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করতে খুবই নিরীহ ও সরল একটি ছক কষে বসলেন:

"রাষ্ট্রে এখন চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের চাহিদাও একে অপরের বিপরীত। কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিষ্টান কেউবা সেক্যুলার। প্রত্যেকেই নিজের শাসন চায়। এখন এই মতানৈক্য থেকে বের হওয়ার পন্থা একটিই আর সেটি হলো, প্রতিনিধি নির্বাচন। এই প্রতিনিধিগণ সংসদে একত্র হয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দাবিগুলো তুলে ধরবেন। আর যেহেতু অধিকাংশ পার্লামেন্টেরিয়ান মুসলিম তাই মুসলিমদের দাবিগুলোই বাস্তবায়িত হবে। তখন সংবিধান পরিপূর্ণ ইসলামীভাবেই রচিত হবে। সেখানে শরীয়াহকে মূলভিত্তি নির্ধারণ করা হবে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাবে। সামরিক বাহিনীও আনুগত্য করবে, সরকারি সব সেক্টর ইসলামপন্থীদের হাতে চলে আসবে। যেহেতু শরীয়াহ আল্লাহ তাআলার বিধান তাই এই মর্মে ধীরে ধীরে পার্লামেন্ট ও জনগণের ভূমিকা কমে আসবে। তারপর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার এই মহান লক্ষ্য খুব বেশি ক্ষতি ছাড়াই অর্জিত হয়ে যাবে।

তাই এই পরিস্থিতিতে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করলে কোনো অসুবিধে নেই! গণতন্ত্রের শিরকি নীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই! বরং সেখানে ঢুকে গণতন্ত্রকে তার আসল অর্থ থেকে মুক্ত করা হবে। এটিকে একটি মাধ্যম হিসেবেই শুধু ব্যবহার করা হবে। আর একজন ইসলামপন্থী সাংসদের ভূমিকা হলো শুধু মুসলিম জনগণের এই আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া যে, তারা শরীয়াহ শাসন চায়। আবার মানবরচিত সংবিধানকে তাদের আঁকড়ে ধরতে হবে না, কারণ সংবিধান রচনা করবেই হলো ইসলামপন্থীরা।"

এভাবে সরল ছক কষে যারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করছেন তারা একসময় পার্লামেন্টপন্থাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, এতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

আচ্ছা যাহোক, উপরিউক্ত সরল সমীকরণের কারণে অনেকেই এই ধারণা করে বসে থাকবেন যে, সত্যিই হয়তো তখন সাংবিধানিক আইনশূন্য কোনো পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, যখন আমাদের এই ভাইয়েরা পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন প্রথম থেকেই তারা গণতন্ত্রের সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে তবেই প্রবেশ করেছিলেন। যত কিছুরই তারা দোহাই দিক-না কেন, যত আবেগী বক্তব্যই পেশ করুক না কেন, বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই। কয়েকটি প্রমাণ দিই,

প্রথম: তারা মিসরের সাংবিধানিক ঘোষণাপত্রের[১০৫] চতুর্থ ধারাকে মেনে নিয়ে তবেই পার্লামেন্ট ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন। যেখানে সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিল: কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা তাদের কর্মতৎপরতা ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া অবৈধ বলে গণ্য হবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এটি দেখার পর তথাকথিত এক ইসলামপন্থী মন্তব্য করেছিলেন: যেহেতু সকলে এই ধারার ওপর একমত যে, ধর্মভিত্তিক দল সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেবে তাহলে ঠিক আছে, কোনো ধর্মভিত্তিক দল আর থাকবে না!

এটাই হলো পতনের সূচনা! অল্পসংখ্যক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে, নিজেকে গণতান্ত্রিক জাহির করতে গিয়ে তারা ধর্মভিত্তিক দল বিলুপ্তির আইনকেই সমর্থন দিয়ে দিলেন! সে সাথে মানবরচিত সে আইনের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করলেন, যা নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় স্লোগান ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে, পার্লামেন্টে ইসলামপন্থীদের একমাত্র ভূমিকা হলো, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রতি জনগণের আগ্রহের কথা সংসদে পৌঁছে দেওয়া।

---

১০৫. জরুরি অবস্থায় যখন সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে তখন সাময়িকভাবে অন্তর্বর্তীকালের জন্যে যে ছোট সংবিধানের ঘোষণা দেওয়া হয় সেটিকেই সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসনে মোবারকের পতন ঘটার পর যে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়ে রচিত সাংবিধানিক ঘোষণাপত্রটি।

এই ধারণা সম্পূর্ণ বাস্তবতা-বিবর্জিত। এটিই যদি তাদের একমাত্র ভূমিকা হতো তাহলে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা তাদের প্রকাশ্য স্লোগান হতো—যদিও তারা ধারণা করেন, এই উদ্দেশ্যেই তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ড—কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইসলামপন্থীরা শরীয়াহকে পার্লামেন্টের দোরগোড়ায় রেখে চলে আসেন। একসময় ধারণা করা হয়েছিল তারা নিজেদের কর্মের স্বীকৃতি শরীয়াহ থেকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু এ-সমস্ত ধারাগুলো মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তারা মূলত পার্লামেন্টভিত্তিক কার্যকলাপের বৈধতা শরীয়াহ থেকে না নিয়ে জনগণ থেকে নিচ্ছেন। কেননা, জনগণ তাকে নির্বাচিত করেছে। এভাবেই ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের নীতিগুলোকে তারা একের পর এক মেনে নিচ্ছেন।

কল্পনা করুন, কোনো ইসলামপন্থী সাংসদ সংসদের দোরগোড়ায় অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে বলা হলো, কোন পরিচয়ে তুমি এখানে প্রবেশ করবে? সে জবাব দিল: শরীয়াহর পরিচয়ে। আর এটি বাস্তবায়ন করতেই মূলত জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছেন। তারপর তাকে বলা হলো: না, এই পরিচয়ে এখানে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না। তোমার স্বীকার করে নিতে হবে যে, তুমি সংসদে প্রবেশ করছ সে জনগণের পরিচয়ে যারা তোমাকে নির্বাচিত করেছে। তুমি আইনপ্রণেতা হিসেবে বৈধতা পাচ্ছ শুধু জনগণের নির্বাচন থেকে, শরীয়াহ থেকে না। জনপ্রতিনিধি পরিচয়ের কারণেই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তোমার আবেদন গ্রহণ করা হবে।

এই কথা শুনে সে ইসলামপন্থী সাংসদ নিজের পরিচয়ের পোশাক ছুড়ে ফেললেন আর তাদের দেওয়া সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন। চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে শুরু করলেন সে পরিচয়ে যে পরিচয় তার কপালে জুটেছে জনগণের কারণে। তার উদাহরণ পুরোপুরি এতিমখানার সে ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলেছিল শর্ত পূরণ করতে গিয়ে।

গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেওয়ার এই ছাড়কে অনেকেই প্রাথমিক বা সাময়িক অবস্থান ভেবে ভুল করলেও এটিই হলো মূলত পতনের সূচনা। বিচ্যুতি ও বিকৃতির পর্ব শুরু হয় এখান থেকেই। এই পন্থাতেই আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বান্দার হাতে রাখা হয়। অনেক আরব রাষ্ট্র আরব বসন্তের পর আইন সংশোধন করে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কেননা, এভাবেই গণতন্ত্র নামক ধর্ম পূর্ণতা পায়।

এই পর্বের সারকথা হলো: গণতন্ত্রে একজন সাংসদ নিজের বৈধতা গ্রহণ করেন জনগণ থেকে, আল্লাহ দেওয়া শরীয়াহ থেকে নয়। আর গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো, মুসলিম-বিশ্বকে পশ্চিমের গোলামে পরিণত করা।

'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কি যথেষ্ট?

প্রিয় ভাইয়েরা, গত পর্বে আমরা বলেছিলাম, গণতন্ত্রে একজন সাংসদ নিজের বৈধতা নির্ধারণ করেন জনগণের নির্বাচন থেকে। আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহ থেকে নয়। দল ও নির্বাচন-কেন্দ্রিক সাংবিধানিক ধারাগুলো এই বিষয়টিকে আরও পাকাপোক্ত করে। অতএব একজন ইসলামপন্থী সাংসদ এই ধারাগুলো মেনে নেওয়ার মাধ্যমে প্রথম দিন থেকেই শরীয়াহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এসব কিছুর পরও গণতন্ত্রের প্রভুরা আরও অনেক জাল বিছিয়ে রেখেছে, যাতে এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সাংসদ শরীয়াহ প্রয়োগের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত। বিছিয়ে দেওয়া সে জালগুলোর একটি হলো, মানবরচিত সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শপথ গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ মিসরের সাংবিধানিক ঘোষণাপত্রের ৪২ নং ধারায় উল্লেখিত আছে, প্রত্যেক সংসদীয় ও নির্বাচন কমিটির সদস্য কাজে যোগদানের পূর্বে নিজ নিজ স্থানে নিম্নোক্ত শপথবাক্য পাঠ করবে: আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি দেশ ও গণতন্ত্রের সুরক্ষায় একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করে যাব। জনগণের কল্যাণের প্রতি সদা সচেতন থাকব। সংবিধান ও আইনের প্রতি সদা শ্রদ্ধাশীল থাকব।

এখন আসুন, সংবিধানের সর্বশেষ সংস্করণে উল্লেখিত কয়েকটি ধারা আমরা দেখে আসি। যেগুলোর ওপর শ্রদ্ধাশীল হবেন বলে আমাদের 'ইসলামপন্থী' ভাইয়েরা শপথ করেছেন।

প্রথম ধারা: গণপ্রজাতন্ত্রী আরবী মিসর। এই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র, যা নাগরিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।[১০৬]

---

১০৬. ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে: আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" এই কথাগুলোই আবার উল্লেখ আছে, মূল সংবিধানের

তো শাসনব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্টের, আল্লাহর নয়। এটি আবার নাগরিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই রাষ্ট্র কোনো ধর্মে পার্থক্য করবে না। এমনকি খ্রিষ্টান ও ইসলামত্যাগীরাও শাসক ও বিচারকের পদ পাওয়ার উপযুক্ততা রাখে অথচ উলামাদের ঐকমত্যে এসব নাজায়েয।

এই বিষয়টিকে আরেকটু জোর দিয়ে সপ্তম ধারায় বলা আছে: আইনের সামনে সমস্ত নাগরিক সমান। অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। ধর্ম, বর্ণ, জাত, ভাষা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে একে অপরের মাঝে কোনো পার্থক্য করা যাবে না।[১০৭]

তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে: ক্ষমতা শুধু জনগণের। আর ক্ষমতার উৎস তারাই—অর্থাৎ, আইন প্রণয়ন, তা প্রয়োগ ও শাসনক্ষমতা শুধু তাদেরই।[১০৮] এই ধারায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ক্ষমতা ও আনুগত্য আল্লাহর জন্যে হতে পারবে না; বরং জনগণ নিজের আইন নিজে প্রয়োগ করবে।

২৪ নং ধারায় উল্লেখিত আছে: কোনো আইনের ঘোষণা দেওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা হবে জনগণের নামে।

লক্ষ করুন, আল্লাহর হুকুম হিসেবে আইন প্রয়োগ করা হবে না; বরঞ্চ জনগণের চাহিদা হিসেবে তা প্রয়োগ করা হবে। জনগণের অধিকার, ক্ষমতা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতেই শুধু আইন ঘোষণা করা হবে।

৩৩ নং ধারায় বলা আছে: জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সাথে সাথেই আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা পাবেন।[১০৯] এটা-সহ চতুর্থবার নিশ্চিত করা হলো যে, আইন প্রণয়নকারী আল্লাহ নন; বরং জনপ্রতিনিধিগণ।

দ্বিতীয়ভাগের ৮ম পরিচ্ছেদে।

১০৭. বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ নং ধারায় উল্লেখ আছে: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। (তৃতীয় ভাগ/মৌলিক অধিকার)।

১০৮. বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ নং ধারায় উল্লেখ আছে: প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (প্রথম ভাগ/প্রজাতন্ত্র)।

১০৯. বাংলাদেশ সংবিধানে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদ।

আমার ভাইয়েরা, এই ধারাগুলো হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূল ভিত্তিপ্রস্তর। আল্লাহর দীনের সাথে বিরোধপূর্ণ গণতন্ত্র ধর্মের মূল স্তম্ভ। আল্লাহ বলেন:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾

'নাকি তাদের এমন কোনো শরীক দেবতা রয়েছে, যারা তাদের জন্যে এমন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[১১০]

তিনি আরও বলেন:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'তারপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ শরীয়াহর ওপর ; কাজেই আপনি এর অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।'[১১১]

জনগণ ও পার্লামেন্টের নিকট শাসনভার ন্যস্ত করার মানে হলো তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করা, যারা ওহী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিছুই জানে না।

আর তাদের তৈরি এই সংবিধানের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হবেন বলে শপথ গ্রহণ করেছেন ইসলামপন্থী সাংসদগণ! তাদের এই শপথবাক্য অনেকটা এমন: মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমি আল্লাহর পরিবর্তে জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব! মহান আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব! মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি: আমি আইনের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে মানুষকেও অংশীদার করব!

গভীরভাবে চিন্তা করলে এগুলোই হলো তাদের এই শপথের ভাবার্থ। ইসলামপন্থী সাংসদগণ সংবিধানের সবকিছু হুবহু মেনে নিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ!

শপথ চাওয়ার এই বিষয়টি গণতন্ত্র ধর্মের এক আশ্চর্যজনক বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয়। এই ধর্ম সাংসদদের কোনো ধরনের ধর্মীয় দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে বাধা দেয়, এরপর এটিই আবার নিজেকে রক্ষা করতে ধর্মীয় শপথ উঠাতে বাধ্য করে।

---

১১০. সূরা শুরা: ২১।
১১১. সূরা জাসিয়া: ১৮।

এখন কেউ যদি এই প্রশ্ন করেন যে, সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় তো উল্লেখ আছে যে, "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম, আরবী সরকারি ভাষা, আর ইসলামী শরীয়াহর মূল ভিত্তিগুলো এই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস।"[১১২]

আমার ভাইয়েরা, এই ধারাটি এককথায় অকার্যকর। কেন? আচ্ছা আমরা প্রথমে, সংবিধানকে এক পাশে রেখে ধারার উদ্ধৃতিগুলো একে একে বিশ্লেষণ করব। তারপর পুরো সংবিধানের সাথে এই ধারাটিকে মিলিয়ে দেখব যাতে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, এই ধারাটি আসলেই কি ইসলাম-সমর্থিত? নাকি না?

প্রথমে ধারার উদ্ধৃতিগুলো নিয়ে বলি:

"ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম"। এটি তো স্পষ্ট বিষয় যে, এই বাক্যটি সংবিধান প্রণেতাদের নিকট কোনো অর্থই রাখে না; বরং বলতে গেলে এটি একটি সুন্দর ডেকোরেশন। যার সাহায্যে খুব সহজে মানুষদের বোকা বানিয়ে তাদের উপহাস করা যায়। এই কথাটি বুঝতে পারবেন যদি একটি বিষয় লক্ষ করেন; কেউ মুসলিম দেশে আল্লাহকে দিনদুপুরে প্রকাশ্যে গালি দিল, তার বিধান নিয়ে মজা উড়াল, কিন্তু লোকটির জাতীয় আইডিকার্ডে লেখা রয়েছে 'ধর্ম: ইসলাম'। এখন আপনি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে কখনোই বিজয়ী হবেন? আপনি নিজেই জানেন যে, না, আপনি কখনোই বিজয়ী হবেন না।

এভাবে সে লোকটির বাবা মারা যাওয়ার পর আপনি যদি মামলা দায়ের করে বলেন যে, তার বাবা মুসলিম ছিল কিন্তু সে কাফের। আর একজন কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায় না। আদালত কি আপনার এই যুক্তি মেনে নেবে? যদি সে লোকটি কোনো মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করে রাষ্ট্র কি এই বিয়েতে বাধা দেবে? কেন দেবে না? কারণ, সরকারিভাবে এই লোকটির ধর্ম ইসলাম; বরং আপনি যদি তার বিরুদ্ধে কুফরী ও রিদ্দার মামলা করেন, আর এ-কারণে সে যদি আপনার বিরুদ্ধে হয়রানির মামলা ঠুকে দেয়, তাহলে স্পষ্ট কথা এই মামলায় সে-ই বিজয়ী হবে।

যে রাষ্ট্র এই মুরতাদ ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় ইসলাম বলে জিদ ধরে আছে, ঠিক সে রাষ্ট্র নিজের ধর্মীয় পরিচয় ইসলাম লিখে রেখেছে। 'ধর্ম' শব্দটি যেভাবে এই ব্যক্তির

---

১১২. বাংলাদেশ সংবিধানের ২ নং ধারায় উল্লেখ আছে: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন। (প্রথম ভাগ/প্রজাতন্ত্র)।

পরিচয় বহন করছে ঠিক একইভাবে সংবিধানের ক্ষেত্রেও একই পরিচয় বহন করছে। বোঝা গেল, রাষ্ট্রের নিকট এই উদ্ধৃতির কোনো গুরুত্বই নেই।

এখন আসুন এই ধারার দ্বিতীয় অংশটিতে: ইসলামী শরীয়াহর মূল ভিত্তিগুলো এই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস।[১১৩]

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যেই নির্ধারিত, আর এটি তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদুর রুবিয়্যাহর একটি অংশ। আল্লাহ অন্যতম প্রভু! কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্যতম কোনো প্রভু নেই! এই ধরনের বাক্যগুলোর সাথে ধারার উপরিউক্ত বক্তব্যের খুব বেশি একটি পার্থক্য নেই। জাহেলী যুগে আরবদের বিশ্বাসও অনেকটা এমন ছিল। তারা ভাবত আল্লাহ হলো অন্যতম প্রভু তবে তাঁর সহযোগিতায় আরও ছোটখাটো কিছু প্রভু রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْۚ فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ﴾

'তোমাদের এই বিপদের কারণ হলো, যখন এক আল্লাহর দিকে তোমাদের ডাকা হতো, তখন তোমরা অস্বীকার করতে। আর যখন তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা হতো তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। শাসন তো শুধু সে আল্লাহর যিনি মহান ও সুউচ্চ।'[১১৪]

যখন তাদের শুধু শরীয়াহ আইনের দিকে ডাকা হয় তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, শরীয়াহর সাথে আরও কিছু উৎস থাকা জরুরি।

﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ﴾

---

১১৩. এই অংশটি বাংলাদেশ সংবিধানে নেই। তবে বিভিন্ন সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রচারণাপত্রে, কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন প্রণয়ন না করা অঙ্গীকার করেন। অনেকেই মদীনা সনদে দেশ পরিচালনা করার কথা বলেন।

১১৪. সূরা গাফির: ১২।

‘যখন শুধু আল্লাহর নামই উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে।’[১১৫]

এই ‘অন্যতম উৎস’ বাক্যটির মূল অর্থ হলো, পার্লামেন্টের সামনে অন্যান্য আইনের সাথে শরীয়াহ আইনও পেশ করা হবে। আর আইন প্রণয়ন করবে পার্লামেন্ট। যা তার নিকট পছন্দনীয় ঠেকবে তা গ্রহণ করবে আর যা ভালো লাগবে না তা গ্রহণও করবে না। শরীয়াহর চেয়ে মানবরচিত আইন যদি তাদের নিকট জনগণের জন্যে অধিক কল্যাণকর মনে হয় তখন সে আইনই তারা প্রয়োগ করবে। আর এটিই হলো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক। অথচ আল্লাহ তাঁর সাথে যাদের শরীক করা হয় তার কতটা ঊর্ধ্বে।

﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾

‘তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।’[১১৬]

এখন কেউ যদি এই প্রশ্ন করেন যে, এই ধারাটিকে এতটা নেতিবাচকভাবে না নিয়ে এমনও তো মনে করতে পারেন যে, যে সমস্ত বিষয়ে শরীয়াহর কোনো বক্তব্য নেই সেসব বিষয়ে অন্যান্য উৎস থেকে সাহায্য নেওয়া হবে।

এর উত্তর হলো: শরীয়াহ নিজেই, যেসব বিষয়ে তার বক্তব্য নেই সেসব বিষয়ে অন্যান্য উৎস থেকে সাহায্য নেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে তা শরীয়াহবিরোধী আইনে পরিণত না হয়। তাহলে ‘অন্যতম উৎস’ শব্দের আর কী প্রয়োজনীয়তা রইল?

চেঙ্গিস খান তার ইয়াসাতে, নেপলিয়ন বোনাপার্ট মিসরে তার শাসনামলে অন্যান্য উৎসের সাথে কিছু কিছু শরীয়াহ আইনও প্রয়োগ করেছিল। তাই বলে কি তাদের শাসনকে ইসলামী শাসন বলা হবে?

এ তো গেল ‘অন্যতম উৎস’ বাক্য সম্পর্কে কথা। কিন্তু বিষয়টি কি এখানেই শেষ? না। ধারাটি আবার পড়ুন। “ইসলামী শরীয়াহর মূল ভিত্তিগুলো এই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস।”

---

১১৫. সূরা যুমার: ৪৫।
১১৬. সূরা কাহাফ: ২৬।

তাদের নিকট ইসলামী শরীয়াহর মূল ভিত্তিগুলো কী কী? ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, শ্রদ্ধা, উন্নতি, সভ্যতা, জীবন ও সম্পদ রক্ষা ইত্যাদি। খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, কাদিয়ানি, কনফুসী, বাহাঈ, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্রসহ সব ধর্মের মূল ভিত্তিও কিন্তু এগুলোই। এককথায় বাক্যটি হেঁয়ালিপনা ও দুর্বোধ্যতায় ভরপুর। যার আদৌ কোনো কার্যকারিতা নেই।

'শরীয়াহর মূল ভিত্তিগুলো' বাক্যটি পাল্টে 'শরীয়াহ আইনের ভিত্তিতে' রাখতে যখন প্রস্তাব করা হলো তখনো বাধ সাধলেন এই ইসলামপন্থীরাই! তারা বাক্যটি এভাবেই দুর্বোধ্য থাকার পক্ষে মত দিলেন।

তাই বোঝা গেল, 'ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম, আরবী জাতীয় ভাষা, আর ইসলামী শরীয়াহর মূল ভিত্তিগুলো এই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস' বাক্যে উল্লেখিত ধর্ম শব্দের আদৌ কোনো অর্থ কিংবা প্রভাব নেই, আবার 'মূল ভিত্তি' শব্দেরও অর্থ, মারাত্মক দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট। এটিরও কোনো নির্ধারিত অর্থ কিংবা প্রভাব নেই। আবার 'আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস' বলার কারণে আল্লাহর জন্যে আইন প্রণয়নের একক কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয় না।

এতক্ষণে আমাদের নিকট নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, গণতন্ত্রের হর্তাকর্তাগণ সংবিধানের কোনায় কোনায় এমনভাবে জাল বিছিয়ে রেখেছেন যে, কোনোভাবেই যাতে এগুলোকে ব্যবহার করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ডাক দেওয়া না যায়; বরঞ্চ এই ধারাগুলো তৈরি করা হয়েছে জনগণের চোখে ধুলো দিতে।

এই পর্বের সারকথা হলো: 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাক্যটি হেঁয়ালিপূর্ণ; বরং এই বাক্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বান্দাকেও শরীক করছে।

শরীয়াহকে মানুষের অনুগামীকরণ

প্রিয় ভাইয়েরা, গত পর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'রাষ্টধর্ম ইসলাম' নামে যে ধারাটি আছে সেটি ব্যবহার করে শরীয়াহ প্রয়োগ করার ধারণা কতটা কল্পনাপ্রসূত। তবুও অনেকেই বলবেন, এই ধারাটির গুরুত্ব একেবারেই শেষ হয়ে যায়নি। কারণ, উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সংবিধানের কোনো আইন শরীয়াহর অকাট্য বিধানের বিপরীত হতে পারবে না।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই সিদ্ধান্ত দুই কারণে বাস্তবতায় কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারবে না। কম গুরুত্বপূর্ণ কারণটিই প্রথমেই বলি।

প্রথম কারণ: উচ্চ আদালত তার সিদ্ধান্তে শরীয়াহ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন, নির্ধারিত কোনো অর্থে রাখেননি। সেখানে শরীয়াহর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, শরীয়াহর বিধান বলা হয় সেগুলোকে যেগুলো প্রতিনিধিত্ব করবে ইসলামী শরীয়াহর মূলভিত্তিকে ও সেসব অকাট্য মূলনীতিকে, যা অপব্যাখ্যা কিংবা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই।

আচ্ছা বাক্যটি আবার খেয়াল করুন: "শরীয়াহর মূলভিত্তিকে ও সেসব অকাট্য মূলনীতিকে, যা অপব্যাখ্যা কিংবা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই।"

'শরীয়াহর মূলভিত্তি' বাক্যটির ব্যাপকতা আমরা গত পর্বে বর্ণনা করেছি। এখন আসুন 'অকাট্য মূলনীতি' বাক্যটিতে। এটা তো জানা কথা যে, সেক্যুলার ও মোডারেটগণ সুন্নাহর অকাট্যতাকে স্বীকার করেন না। তাদের নিকট অকাট্য হলো শুধুই কুরআন। কারণ, তারা জানে সুন্নাহকে বাদ দিলে কুরআনের অপব্যাখ্যা খুব সহজ হয়ে যায়। হযরত আলী ﷺ বলেন: যদি প্রবৃত্তিপূজারিগণ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের নিকট যুক্তি পেশ করে তাদের নিকট হাদীসের মাধ্যমে তর্ক করো। কেননা, কুরআনের বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব।[১১৭]

এই কারণে উচ্চ আদালত, 'শরীয়াহর অকাট্য মূলনীতি' বাক্যটির মাধ্যমে মূলত সেক্যুলারদের পদ্ধতিতে সুন্নাহকে বের করে দেয়। আর পরবর্তী বাক্য 'যা অপব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই' বলার মাধ্যমে তারা কুরআনেরও অধিকাংশ আয়াত বের করে দেয়।

শরীয়াহকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখতে কোর্ট আরও জানিয়েছে, "যেকোনো ফকীহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এমন নয় যে শুধু একজনের সিদ্ধান্তের ওপর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্বীকৃত মতের বিপরীতে অনেক দুর্বল মতও বর্তমান পরিস্থিতির সাথে অধিক খাপ খেয়ে যায়।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে ইজমার বিপরীতে বিচ্ছিন্ন মতের ওপরও নির্ভর করার সুযোগ তৈরি হয়। এমনকি প্রয়োজনের সময় শিয়াদের মতের ওপরও নির্ভর করা যাবে বলে

---

১১৭. আদ দুররুল মানসুর লিস সুয়ুতী: ৪০/১।

জানিয়েছেন সংবিধান-বিশারদ আব্দুর রাজ্জাক সানহুরী! তিনি তার গ্রন্থে লেখেন: শিয়া মতবাদ থেকেও উপকৃত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।[১১৮]

আচ্ছা এতকিছুর পরও উচ্চ আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন কোনো গ্রন্থ কি আছে, যার নাম 'শরীয়াহর সেসব মূলভিত্তি ও অকাট্য মূলনীতি, যা অপব্যাখ্যা কিংবা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই'। আছে এমন কোনো গ্রন্থ? যাতে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়—'মূলভিত্তি' কিংবা 'অকাট্য মূলনীতি' বলতে তারা আসলে কী বোঝাতে চান। না এমন কোনো গ্রন্থ তাদের নেই। বিষয়টি উনারা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য করে রেখেছেন।

এখন অনেকেই প্রশ্ন করবেন: কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই কাজে আসতে দেখা গেছে। যেমন ধরুন, মদ পরিবেশন না করার অপরাধে দুই মিসরী বিমানবালাকে যখন বরখাস্ত করা হয়েছিল তারা কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়েই আবার নিজেদের চাকরি ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরও বিভিন্ন সময় উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্ত কাজে আসতে দেখা যায়।

আমি বলব, প্রিয় ভাইয়েরা, বাতিল সব সময় মানুষের সামনে কিছু আশার আলো জ্বালিয়ে রাখে যাতে মানুষদের ধোঁকা দিয়ে নিজেদের সীমানায় আটকে রাখতে পারে। এর বিপরীতে যদি তারা মানুষদের সামনে নিজেদের কুৎসিত চেহারা উন্মোচন করে তখন জনগণ তাদের সীমানা থেকে মুক্ত হয়ে বিকল্প রাস্তা খুঁজতে বাধ্য হবে। আর নাহয় আপনিই বলুন! এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে ইসলামপন্থীগণ এত বছরে কী ফায়দা উঠাতে পেরেছে? এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কি তারা আইন-কানুনকে ইসলামসম্মত করতে পেরেছে? মদের বার ও বেশ্যালয় তো এখনো উন্মুক্ত, ইসলামকে কটাক্ষ করে এখনো তো পত্রিকাগুলো কলাম ছাপায়, ধারাবাহিকভাবে ইসলামবিদ্বেষী বই প্রকাশিত হচ্ছে এখনো, দা'ওয়াতের ওপর নেমে আসছে খড়্গ, গাজ্জাবাসীদের প্রতি অনুদান এখন নিষিদ্ধ, নওমুসলিম বোনদের রেখে আসা হচ্ছে গির্জায়। এতকিছুর পর ইসলামপন্থীরা উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে কি এই অপরাধগুলো বন্ধ করতে পারছেন? অথচ বাস্তবতা হলো, এই সিদ্ধান্তগুলোর উপস্থিতিতেও একের পর এক ইসলামবিরোধী আইন পাশ হচ্ছে। আর ফৌজদারি, রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক আইনে ইসলাম

---

১১৮. আল ওয়াসীত ফি কানুন আল মাদানী: ৪৯/১।

বরাবরের মতোই অনুপস্থিত। যদি সত্যই এগুলো কাজে আসতো তাহলে কেন শরীয়াহবিরোধী আইন বাতিলে এগুলোকে কাজে লাগানো হয়নি?

তাই বিচ্ছিন্ন একটি কিংবা দুটি ঘটনায় শরীয়াহসম্মত বিচার হওয়ার কারণে পুরো বিষয়টিকে বৈধতা দেওয়া যায় না; বরং বিচ্ছিন্ন এই ঘটনাগুলো মূলত জনগণের মাঝে সংবিধানের আলোকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মিথ্যে আশা জিইয়ে রাখতে ঘটানো হয়।

এটি গেল প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ: সংবিধান ও উচ্চ আদালত শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করলেও তা করবে জনগণের আদেশে। সামান্য যা শরীয়াহ প্রয়োগ হবে, তা আল্লাহর হুকুম বলে প্রয়োগ হবে না; বরং যেহেতু সংবিধান, কোর্ট ও পার্লামেন্ট এই আইন বাস্তবায়নের অনুমতি দিয়েছে তাই এটি বাস্তবায়িত হবে। ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এর মাধ্যমে প্রভুর শাসনের ওপর জনগণকে শাসন করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়।

যদি ইসলামসম্মত কোনো আইন প্রয়োগও করা হয়, তা এই ধারণা করে প্রয়োগ করা হবে না যে শরীয়াহ আল্লাহর হুকুম কিংবা তার অলঙ্ঘনীয় বিধান; বরং যেহেতু জনগণ এই আইন চায় সে হিসেবে তা বাস্তবায়ন করা হবে। যা তারা ইচ্ছা করলেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সম্ভব। কারণ, জনগণ ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা শরীয়াহর ওপর। পার্লামেন্ট চাইলেই অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে শরীয়াহকে পরিবর্তন কিংবা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে। এই কথাটি স্পষ্টভাবে বুঝে নিন যে, শরীয়াহকে আল্লাহর দাসত্বের উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁর আদেশ মেনে নিতে প্রয়োগ করা হবে না; বরং তা পার্লামেন্টের ইচ্ছার দিকে লক্ষ্য রেখে মেনে নেওয়া হবে।

প্রতিটি স্তরে সংবিধান আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে মানবপ্রবৃত্তির অধীন করে রেখেছে:

প্রথমত: সংবিধানে ইসলামী যে ধারাটি আছে তা পার্লামেন্টের ইচ্ছার অধীন। কারণ, ৭১ নং ধারায় বলা আছে: যেকোনো প্রেসিডেন্ট কিংবা সাংসদের অধিকার আছে, সে সংবিধানের যেকোনো ধারা পরিবর্তন করার আবেদন করতে পারবে।[১১৯] এর

১১৯. বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং ধারায় উল্লেখ আছে: সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোনো

ভেতর নিশ্চয় এই ধারাটিও শামিল। এরপর আবার ৬০ নং ধারায় বলা আছে, সংবিধান অনুযায়ী আমল করতেও জনগণের সম্মতি থাকা অত্যাবশ্যক। আর তা ছাড়া সংবিধানে এমন কোনো উদ্ধৃতি তো নেই যদ্দরুন এই ধারাটিকে আবশ্যক ঘোষণা করা যাবে। তাই পার্লামেন্ট বা জনগণ চাইলেই এটি পালটে ফেলতে পারে।

দ্বিতীয়ত: সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ধারাটি বাস্তবায়িত হবে শুধু পরবর্তী সময়ে তৈরি আইনের ক্ষেত্রে। আর পুরাতন আইনে এর কোনো প্রভাব থাকবে না।

তৃতীয়ত: সংবিধানের অন্যান্য ধারার ওপর এই ধারাটির কোনো ধরনের কর্তৃত্ব বা প্রভাব নেই। এটির প্রভাব থাকবে শুধু আইনে, সংবিধানের অন্যান্য ধারার ওপর নয়; বরং সংবিধান-প্রণেতাগণ শরীয়াহসম্মত ধারাটিকে অন্যান্য শরীয়াহবিরোধী ধারাগুলোর সাথে একসাথে মিলিয়ে রেখেছেন। সানহুরী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ইসলামী ফিকহ ও সাংবিধানিক অন্যান্য ধারাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। এমনকি—বক্তব্যের ধরন লক্ষ করুন—যদি অন্যান্য ধারাগুলোর মূলনীতির সাথে ইসলামী আইনের বৈপরীত্য ঘটে তাহলে শরীয়াহকে ছেড়ে দেওয়া হবে। যাতে করে রাষ্ট্রের আইনগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গতিশীল হতে পারে।[১২০]

উপদেষ্টা হামেদ জামাল বলেছেন: সংবিধানের ইসলামী ধারাটিকে অন্যান্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বিশেষ করে সব নাগরিকের মাঝে সমতা রক্ষার ব্যাপারে ইসলামকে টেনে আনা উচিত নয়।

অর্থাৎ, যদি জনগণের ক্ষমতা, জাতীয়তা, নাগরিকত্ব, ধর্মত্যাগের অধিকার ও অমুসলিমের কর্তৃত্বসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে যখন শরীয়াহর কোনো বিধান সংবিধানের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে তখন সংবিধান অনুযায়ী আমল করা হবে আর আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই অবস্থায় আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমল করা তাদের কথানুযায়ী বৈধ হবে না।

বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে। (দশম ভাগ/ সংবিধান সংশোধন)।

১২০. আল ওয়াসীত ফি কানুন আল মাদানী: ৪৮-৪৯/১।

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾

'তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক!'[১২১]

চতুর্থত: কোনো নতুন আইন সংবিধানের ইসলামী ধারা অনুযায়ী শুদ্ধ হবে কী হবে না সেটি নির্ধারণ করার অধিকার শরীয়াহর থাকবে না; বরং এই বিষয়টি নির্ধারণ করবে সাংবিধানিক বেঞ্চ, যাদের কারও শরীয়তের ন্যূনতম জ্ঞান পর্যন্ত নেই। বরং এই আইনটি ইসলামী কী ইসলামী নয় সে বিষয়টি নির্ধারণ করতে তারা সংবিধানের দিকে লক্ষ রাখবে। শরীয়াহর কোনো মূল্যবোধ তাদের নিকট বিন্দুমাত্র মূল্য পাবে না। আবার এই ইসলামী ধারাটির ব্যাখ্যা তারা নিজেদের মনগড়া করবেন। সময়ে সময়ে তারা এই ব্যাখ্যা পাল্টাবেন। খোদ এই আইনটিই স্থায়ী থাকার গ্যারান্টি নেই। কারণ, আদালত শরীয়াহকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং শরীয়াহ এখানে মানবরচিত সংবিধানের অধীন।

পঞ্চমত: পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তেও ইসলামী ধারাটির কোনো গুরুত্ব, কর্তৃত্ব কিংবা প্রভাব বলতে কিছু নেই। শরীয়াহ পার্লামেন্টকে কোনো ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে জোর দিতে পারবে না।

যদি পার্লামেন্ট শরীয়াহর কোনো ফরজ কিংবা ওয়াজিব বিধানের আইন প্রণয়ন করতে চায়, তাহলে অধিকাংশ জনগণের মতের ওপর তাদের ভিত্তি করতে হবে। যদি অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কারও অধিকার নেই তাদের বাধ্য করা! এমনকি খোদ সংবিধানেরও এই অধিকার নেই!

ষষ্ঠত: যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, পার্লামেন্ট কোনো ইসলামী আইন প্রয়োগে সম্মত হয়েছে। তখন সে এই আইনগুলো থেকে 'আল্লাহর শাসন' গুণটি বাদ দিয়ে 'জনগণের শাসন' গুণটি যোগ করবে। যাতে আইনটি সংসদীয় ও সাংবিধানিক হয়।

এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তৃতীয় ধারায় উল্লেখ আছে, ক্ষমতা শুধু জনগণের। চতুর্থ ধারায় আবার উল্লেখ আছে: সমস্ত আইন প্রণয়ন করে প্রয়োগ করা হবে জনগণের নামে। অর্থাৎ যেহেতু জনগণ চায়, সংবিধানও এমনটা বলে তো কোনোভাবেই এর ব্যত্যয় ঘটানো সম্ভব নয়!

---

১২১. সূরা কাহাফ: ৫।

উপদেষ্টা হামেদ আল জামাল লিখেছেন: এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন, সংবিধানে আছে বলেই ইসলামী শরীয়াহ প্রয়োগ করা সম্ভব, ব্যাপারটা এমন নয়। যদি তা প্রয়োগ করতেই হয়, তাহলে হবে জনগণের ইচ্ছায়।"[১২২] অর্থাৎ, আল্লাহর শরীয়াহ হিসেবে এটিকে প্রতিষ্ঠা করা হবে না এমনকি সংবিধান শরীয়াহকে উৎস মনে করলেও না; বরং পার্লামেন্ট শরীয়াহর যে সমস্ত আইন প্রয়োগের অনুমতি দেবে তাদের আদেশের ভিত্তিতে সে সমস্ত আইনই প্রয়োগ করা যাবে।

দার্শনিক টমাস হোবস বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: ইঞ্জিল তখনই আইনে পরিণত হবে যখন জনগণের বৈধ সরকার এটিকে আইনে পরিণত করবে।[১২৩]

সপ্তমত: সংবিধানের ইসলামী ধারাটি বিচারকার্যে বিচারকদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; বরং পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের সময় এটির দিকে লক্ষ রাখা হবে। এই ধারাটির প্রভাব পার্লামেন্টে; আদালতে নয়। সংবিধানের ১৬৫ নং ধারায় বলা আছে, কোর্টে বিচার হবে আইন দ্বারা। প্রায় একই ধরনের কথা এসেছে ৪৬ নং ধারায়, বিচারকার্য সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এখানে কোর্ট বিচার করবে আইন অনুযায়ী।[১২৪] তাই বিচারক মানবরচিত আইনের বিপরীতে যদি শরীয়াহ দ্বারা বিচার করে তাকে বাধা দেওয়া হবে। এই কারণেই মাহমুদ গাররাব নামের এক বিচারককে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কারণ, তিনি মাতাল ব্যক্তির ওপর শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

খোলাসা কথা হলো, এই সংবিধানে 'আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহর বিধান' শাসক নয়; বরং শাসিত।

এগুলো হলো সংবিধানের এই ইসলামী ধারাটির আগপিছের ব্যাখ্যা। যে ধারাটি সীমাবদ্ধ, সীমিত, বিভ্রান্তিকর সর্বোপরি লাঞ্ছিত ও শাসিত। অথচ আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহ পবিত্র, সম্মানিত, মুক্ত, সুস্পষ্ট, মহান ও ক্ষমতাসম্পন্ন।

---

১২২. আল আহরাম পত্রিকা: ০১-০৪-২০১১।

১২৩. লেভিয়াথন। আরবী অনুবাদের ২৫৮ নং পৃষ্ঠা।

১২৪. বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪(৪) নং ধারায় উল্লেখ আছে: এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। (ষষ্ঠ ভাগ/ বিচার বিভাগ)।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমি যখন এই ধারাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম তখন অন্তর ঘেমে উঠেছিল, আল্লাহর প্রতি মানুষের স্পর্ধা দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾

'যারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সে পথে জটিলতা খুঁজে বেড়ায়।'[১২৫]

ওয়াল্লাহি! আল্লাহর শরীয়াহকে এই রূপে বিকৃত না করে, এভাবে মানুষের অনুগামী না বানিয়ে যদি সরাসরি বর্জন করা হতো তাহলেই ভালো ছিল। আল্লাহর শাস্তি তাদের গ্রাস করুক! যাদের অন্তর এক আল্লাহর স্মরণকে অপছন্দ করে। তারা ধ্বংস হোক! শরীয়াহর বিরোধিতা করতে যাদের ঘাড় উঁচু হয়। লাঞ্ছিত হোক তারা! যারা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের ওপর স্পর্ধা দেখায়।

ওহে পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্ট ভাইয়েরা, কী হলো আপনাদের? এই সংবিধানকেই আপনারা স্থায়ী করতে চান? এটির জন্যেই জীবন দিয়ে দেওয়ার কথা বলেন? এই ধারাগুলো সরিয়ে না দিয়ে বাস্তবায়নের কথা বলেন? এই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন? একেই আপনারা উত্তম ও রক্ষণশীল সংবিধান আখ্যা দেন? আপনারাই এই সংবিধানের অল্প একটু পরিবর্তনের কথা বলেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কি আল্লাহর বিধানকে অল্প অল্প করে পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা? মানবরচিত আইনের জন্যে অজুহাত পেশ করা?

সংসদে চেয়ারে বসে অতি তুচ্ছ মানুষ পা নাড়াতে নাড়াতে হাই তুলে মহান আল্লাহর কোনো বিধান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ভোট দেবে। আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে ভোট দেবে অতি নগণ্য মানুষ! তারপর এই আইন পছন্দ না হলে ভ্রু কুঞ্চিত করে বিপক্ষে হাত তুলবে। আর যদি পছন্দ হয় পক্ষে হাত তুলবে এমন একটি ভাব নিয়ে যেন সে বলছে, এটি আল্লাহর বিধান নয়, পার্লামেন্টের বিধান।

ওয়াল্লাহি! শরীয়াহকে এইভাবে বিকৃত করা ছাড়া ইসলামপন্থীরা যদি আর কোনো ছাড়ও না দিতেন তাহলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। ওহে পার্লামেন্টপন্থী, জেনে রাখুন, মানবরচিত আইন কিংবা সংবিধানের ফাঁকফোকরকে কাজে লাগিয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই নিকৃষ্ট অবস্থান থেকে শরীয়াহকে আরও উঁচুতে তুলুন। যেখানে

---

১২৫. সূরা আ'রাফ: ৪৫।

বিধানপ্রণেতা জনগণ সেখানে সংবিধানের একটিমাত্র ধারার ওপর গোঁ ধরে বসে থাকবেন না।

কোনো একটি ধারা কিংবা ব্যাখ্যা সংবিধানের সামগ্রিক রূপকে পাল্টে দেবে না। সংবিধান-প্রণেতাগণ একে এমনভাবে রচনা করেছে, যার উদাহরণ আল্লাহ কুরআনে কীভাবে দিয়েছেন দেখুন;

﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾

'তা মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। একসময় সে যখন এর নিকটবর্তী হয়, তখন কিছুই পায় না। পায় সেখানে আল্লাহকে। অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা এর উদাহরণ সাগরের গভীর তলদেশের অন্ধকারের ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে রাখে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ, আবার তার ওপরে আছে ঘন কালো মেঘ। একের ওপর এক অন্ধকার।'[১২৬]

ঠিক একইভাবে অন্ধকার এই সংবিধানের পাতায় পাতায়, এর উদ্দেশ্যে, জুড়ে দেওয়া শর্তে ও একে বাস্তবায়ন করার মধ্যে। এমন অন্ধকার যে:

﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾

'সে হাত বের করলে তা দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ যার জন্যে কোনো আলো রাখেননি তার জন্যে কোনো আলোই নেই।'[১২৭]

এই পর্বের সারকথা হলো, সংবিধানের ইসলামী ধারাটি জনগণের নামে লিখিত। তারা ইচ্ছা করলে এটিকে রদ করতে পারবে। পূর্ববর্তী আইনে এর কোনো প্রভাব থাকবে না। সংবিধানের অন্যান্য শরীয়াহবিরোধী ধারাগুলোর ওপর এটি সীমাবদ্ধ। এই ধারাটির ব্যাখ্যা শরীয়াহর মূলনীতির সাথে যায় না। এই ধারাটি সংসদকে শরীয়াহর বিধান প্রয়োগ করতে বাধ্য করতে পারে না।

---

১২৬. সূরা নুর: ৩৯-৪০।
১২৭. প্রাগুক্ত।

শরীয়াহবিরোধী আইনের ওপর শপথ করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

আমরা এখনো গণতান্ত্রিক পন্থায় অংশগ্রহণ থেকে মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করে যাচ্ছি। এই পন্থায় তাদের শুধু চেষ্টা ব্যয় হবে, শক্তি ক্ষয় হবে কিন্তু বিনিময়ে কোনো ফলাফল আসবে না; বরং ঘটবে এর উল্টোটা। সেই সাথে এই পন্থার পরিণাম আখেরাতেও ভয়াবহ হবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।

'গণতন্ত্রের দাসত্ব ও পতনের সূচনা' পর্বে আমরা যা বলেছিলাম, তা আবার সাজিয়ে নিই। আমরা সেখানে বর্ণনা করেছিলাম, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অর্পণ করার ভিত্তিতে। আমরা এও বলেছিলাম, এটি এমনভাবে তৈরি, যদি ইসলামপন্থী কেউ এখানে প্রবেশ করতে চায় তাহলে পার্লামেন্টের দরজায় তার শরীয়াহকে রেখে আসতে হবে। শরীয়াহ প্রয়োগের দাবি থেকে সরে আসার প্রথম ধাপ হলো, সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত দল গঠনের নীতিমালা মেনে নেওয়া। কারণ, সেখানে উল্লেখিত আছে যে, ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ। এই গণতন্ত্রে যেহেতু জনগণই নির্বাচিত করেন তাই ইসলামপন্থীরা নিজেদের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন জনগণ থেকে শরীয়াহ থেকে নয়। এরই মাধ্যমেই মূলত গণতন্ত্রের মূলনীতিকে তারা ধাপে ধাপে গ্রহণ করে নেন।

তারপর আমরা বলেছিলাম, শরীয়াহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দ্বিতীয় ধাপ হলো, মানবরচিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শপথ গ্রহণ করা। আমরা সংবিধানের বিভিন্ন উদ্ধৃতিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যে, এখানে আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু জনগণের। তার নামেই এই আইনগুলো পাশ করা হয়। তাই এই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার সহজ অর্থ হলো, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষেকে দিয়ে দেওয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তারপর আমরা শপথ গ্রহণের পক্ষে ইসলামপন্থীদের দেওয়া সবচেয়ে প্রকাশ্য অজুহাতটি উল্লেখ করেছিলাম। অর্থাৎ সংবিধানের সে ইসলামী ধারাটি, যার মধ্যে শরীয়াহকে আইন প্রণয়নের অন্যতম মূল ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। শেষ দুই পর্বে আমরা এই ধারাটিরও যে কোনো মূল্য নেই, তা স্পষ্ট করেছি; বরং এটি যদি সংবিধানে উল্লেখ না থাকত তাহলে আল্লাহর ওপর স্পর্ধা আরও কম দেখানো হতো বলেও আমরা মত ব্যক্ত করেছিলাম।

এ তো গেল শেষ দুই পর্বে বলা আমাদের খোলাসা বক্তব্য। এখন নিশ্চয় বিবেকবান যেকোনো ব্যক্তি মেনে নিতে বাধ্য যে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ হলো, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরক করার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে আইন প্রণয়নকারীরূপে নির্ধারণ করা। এই ধরনের শপথের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম তো সকলেরই জানা; বরং কেউ যদি শপথ ছাড়াই বলে, "মানুষের জন্যেও আইন প্রণয়নের অধিকার সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আমি শ্রদ্ধাশীল" কিংবা "আইন প্রণয়নের অধিকার শুধু আল্লাহর নয়" তার এই বক্তব্য ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর যদি এর ওপর শপথই করা হয় তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াচ্ছে! কেমন অবস্থা হবে যদি বলে, আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি মহান আল্লাহর সাথে শিরক করব!

এই কারণে বিবেকবান সকলেরই প্রথম থেকেই এই কথা মেনে নেওয়া উচিত যে, শুরু থেকেই এই পদ্ধতি হারাম। এখন আসুন আমরা পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টদের সেসব অজুহাতকে শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করি, যেগুলো তারা তাদের শপথের সমর্থনে পেশ করেন।

বাস্তবে যখন তারা তাদের অজুহাতগুলো পেশ করেন তখন আলোচনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেন। যেন বিষয়টি কোনো ছোটখাটো গুনাহ, ঈমানভঙ্গের কোনো বিষয় নয়!

তাদের প্রথম অজুহাত হলো: কিছু কিছু ইসলামপন্থী সাংসদ শপথবাক্য শেষে আরেকটি বাক্য যুক্ত করেন। তা হলো: আমি সংবিধানের সেসব ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব, যা শরীয়াহবিরোধী নয়!

প্রিয় ভাইয়েরা, পার্লামেন্টপন্থীদের এই বক্তব্যের অর্থ অনেকটা এমন: "মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের জন্যেও সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আমি শ্রদ্ধাশীল থাকব। যতক্ষণ তা শরীয়াহবিরোধী হবে না।" আরেকভাবে বললে: মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর নিকট হতে আইন প্রণয়নের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমি শ্রদ্ধাশীল থাকব, যতক্ষণ তা শরীয়াহবিরোধী হবে না।"

তার এই অসম্ভব শপথবাক্য কোনোভাবেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন কেউ বলল: আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি বসে থেকে দাঁড়াব! কিংবা জাগ্রত থেকে ঘুমাব!

প্রিয় ভাইয়েরা, এই কথাগুলো মোটেও বাড়াবাড়ি নয়। আমি কথাকে ঘুরিয়ে ভিন্ন অর্থে রূপান্তরিত করছি না; বরং এই কথাগুলো বলছি তিক্ত বাস্তবতাকে স্পষ্ট করতে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন ইসলামপন্থী সাংসদ শপথের সাথে উক্ত বাক্যগুলো জুড়ে দেন তখন পুরো সংসদ হাততালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। যেন সে তার কর্তব্য পালন করে ফেলতে পেরেছে, অপরাধ ও পাপের রাস্তা এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

এ ধরনের শপথ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার নামান্তর। এই সংবিধান যে সার্বিক দিক দিয়ে মৌলিকভাবে শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক, জনগণ সে ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। সংবিধান হলো মানুষের তৈরি বিধান, যার মূলভিত্তি আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের জন্যে সাব্যস্ত করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর শরীয়াহ হলো আল্লাহর বিধান। এই দুইটি মৌলিকভাবে পরস্পরবিরোধী।

সংবিধানের শুধু কয়েকটি ধারা ইসলামবিরোধী হওয়ার ওপর বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়; বরং গোটা সংবিধানই এখানে ইসলামবিরোধী।

তাদের দ্বিতীয় অজুহাত হলো: ইসলামপন্থী সাংসদ শপথ গ্রহণের সময় অন্তরের নিয়ত পাল্টে ফেলেন। তাদের কেউ উদ্দেশ্য নেন তিনি সংবিধানের ইসলামী ধারাটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিংবা যে সমস্ত ধারা শরীয়াহবিরোধী নয় সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই ধরনের নিয়ত যে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর তা তো কিছুক্ষণ আগেই বর্ণনা করেছি। শপথ গ্রহণের সময় কেউ আবার কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উদ্দেশ্য অন্তরে রাখেন, যেহেতু কুরআন প্রত্যেক মুসলিমেরই সংবিধান। এভাবে নিয়ত পালটে ফেলার পর তারা তাওরিয়া[১২৮]র মাসআলা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে শুরু করেন। বলতে থাকেন যে, শপথকারীর নিয়তই তো ধর্তব্য হবে।

---

১২৮. তাওরিয়াহ বলা হয় এমন বাক্য ব্যবহার করাকে, যা থেকে শ্রোতা ভিন্ন অর্থ বুঝে নেবে। বক্তা বলার সময় নিজের মনে একটি অর্থ রাখলেও শ্রোতা তাকে ভিন্নভাবে বুঝবে। যেমন কেউ বলল: আমার পকেটে এক টাকাও নেই। শ্রোতা ভাবল আসলে তার পকেটে কোনো সম্পদ নেই। কিন্তু বাস্তবে তার পকেটে টাকা না থাকলেও ডলার ঠিকই ছিল। তো প্রয়োজনের সময়, বড় কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম তাওরিয়া করার বৈধতা দেন।

তাদের এতসব অপ্রাসঙ্গিক কথার ভিড়ে মূল আলোচনাই হারিয়ে যায়। মানুষদের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থেকে যায়। অথচ বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর শরীয়াহর প্রতি আনুগত্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

এখন পার্লামেন্টপন্থীদের আমরা আবারও সেসব প্রশ্ন করছি, যা তাদের আগেও করা হয়েছিল, আপনারা পার্লামেন্টে প্রবেশের পর যখন এই শপথবাক্যগুলো পাঠ করেন তখন আপনাদের নির্ধারিত লক্ষ্য কী থাকে? কিছু ছোটখাটো সংস্কার নাকি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা?

উদ্দেশ্য যদি ছোটখাটো সংস্কার হয়, তাহলে শুধু এর বিনিময়ে আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের জন্যে সাব্যস্ত করার উপর শপথ গ্রহণ করা কি জায়েয? তাওরিয়া করে হলেও?

আর যদি বলেন: উদ্দেশ্য হলো শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা। তাহলে এখন আপনার ভাবতে হবে। কল্পনা করা যায়! আল্লাহর কোনো গুণ মানুষের জন্যে সাব্যস্ত করার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব? আল্লাহর রাসূল ﷺ কি কখনো এমনটা করতেন? যদি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বলা হতো: আমাদের মূর্তিকে শুধু একবার সেজদা করো। যদি করো তাহলে তোমার নেতৃত্ব সারা জীবনের জন্যে মেনে নেব। তখন কি আল্লাহর রাসূল এই কথা বলতেন যে: "আমি মূর্তির সামনে সেজদা করার সময় নিয়ত করব আল্লাহকে সেজদা করছি, যেহেতু শুধু একটি সেজদার বিনিময়ে অনেক বড় কল্যাণ সম্ভব?" বলতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন কথা?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আসুন আল্লাহর বাণীর শরণাপন্ন হই। তিনি তাঁর প্রিয় মুহাম্মাদকে ﷺ উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾

আর আমি আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা থেকে তারা আপনাকে পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। যাতে আপনি আমার ওপর সেটার বিপরীত

মিথ্যা রটাতে পারেন। আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবন ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। তখন আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।[১২৯]

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ তালাশ করলে আমরা পাই, কুরাইশের এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর ﷺ নিকট তাদের মূর্তির প্রতি শুধু সম্মান জানানোর আবেদন জানিয়েছিল। ইবাদত তো দূরের কথা। তাদের মূর্তিদের সামান্য স্পর্শ করার আবেদন করেছিল। শুধু এটুকু করলেই তারা কথা দিয়েছিল ইসলামে প্রবেশ করবে। তারা বলেছিল: "হে মুহাম্মাদ, আমাদের উপাস্যদের সামান্য চুমু খাও। কথা দিচ্ছি আমরা তোমার সাথে তোমার ধর্মে প্রবেশ করব।"

অনেক মুফাসসিরগণ মনে করেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ﷺ দৃঢ় রাখার কারণে তিনি তাদের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও পোষণ করেননি। তবুও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যদি মুশরিকদের এই আবেদনে সাড়া দেওয়ার বিন্দুমাত্র টানও তিনি অনুভব করে থাকেন, যদি তাদের সামনে সামান্য ঝোঁকারও চেষ্টা করেন তাহলে তিনি তাকে ইহজীবন ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবেন।

﴿ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾

'তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবন ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতাম। আর আপনি আমার মোকাবিলায় তখন কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।'

ইবাদত তো দূরের কথা সম্মানও প্রকাশ পায়নি। এমনকি সম্মান জানানোর প্রতি আগ্রহও তৈরি হয়নি। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর হুমকি এসেছে। বিনিময় যতই প্রলুব্ধকর হোক-না কেন, সামান্য পরিমাণেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়া যাবে না। কারণ, তাওহীদের ঘোষণা হতে হবে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। তাওহীদের বিষয়ে কোনো ছাড় চলবে না, এর ত্রিসীমায় কোনোভাবে হাঁটা যাবে না। এই আয়াতে রাসূলের ﷺ প্রতি এই সম্বোধন মূলত তার উম্মতকে লক্ষ্য করেই, এই

১২৯. সূরা ইসরা: ৭৩-৭৫।

হুমকি তার পরবর্তী উম্মতের জন্যই। আর নাহয় আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হতে এই ধরনের আচরণ তো পাওয়া অসম্ভব।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই শপথ গ্রহণের কারণে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তিকে কিছু তর্ক-বিতর্কের স্তূপে ধামাচাপা দেওয়া উচিত নয়। আপনি দেখবেন, পার্লামেন্টপন্থীরা তাদের আলোচনায় তাওরিয়া, শপথকারীর নিয়ত ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্ক করলেও, তাদের আচরণে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তির বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যান।

এই সময়টাতে আমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি, সংবিধান শরীয়াহর স্থান দখল করে আছে; বরং শরীয়াহর সম্মানের চেয়ে তার সম্মান আরও বেশি। এখন আল্লাহকে গালমন্দ করার চাইতে শরীয়াহকে গালমন্দ করা আরও বেশি গুরুতর অপরাধ। এতকিছুর পরও পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্টগণ মানুষের সামনে আল্লাহ কে সাক্ষী রেখে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শপথ গ্রহণ করছে, গণতন্ত্রের মূলনীতিকে জোরদার করছে! অথচ এর কোনো আলোচনা ও বিবেচনা পর্যন্ত নেই!

লক্ষ করুন সাহাবাদের নিয়ত সম্পর্কে জানার পরও আল্লাহর রাসূল ﷺ কীভাবে তাদের বক্তব্যকে শুধরে দিচ্ছেন। যখন তাকে বলা হলো, আপনি ও আল্লাহ যা চান তাই হবে। তিনি উত্তর দিলেন: আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে! বলো, আল্লাহ যা চান তা-ই হবে।[১৩০]

অথচ ইসলামপন্থীরা সে সংবিধানের ওপর শপথ গ্রহণ করে মানুষদের বিভ্রান্ত করছে যে সংবিধান স্পষ্টভাবেই মানুষকে বিধানপ্রণেতা ও আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করে।

বরং সংবিধানে এও বলা হয় না যে, আল্লাহ ও জনগণের ইচ্ছা ধর্তব্য করা হবে। সেখানে শুধু উল্লেখ থাকে, জনগণের ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য হবে। এই বক্তব্যটি সাহাবাদের বক্তব্যের মতো নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভালো কিন্তু প্রকাশভঙ্গি খারাপ, কিন্তু এর উভয়টি খারাপ। সংবিধানের এই বক্তব্য এতটাই আবশ্যিক যে, কেউ এর বিরোধিতা করলে তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ হবে। প্রিয় শপথগ্রহকারী ভাইয়েরা, তাওহীদের প্রাচীরকে এভাবে পাহারা দেবেন? এভাবে তাওহীদের দুর্গ ভেঙে, মানুষদের বিভ্রান্ত করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবেন?

---

১৩০. মুসনাদে আহমাদ: ২৫৩/৩।

তারা বলেন: শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মতো মহান কল্যাণের উদ্দেশ্য যেহেতু আমাদের আছে তাই তাওরিয়া করে শপথ গ্রহণের এই ক্ষতিকে আমাদের গ্রহণ করে নিতে হচ্ছে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তারা দলিল পেশ করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইহুদি কা'ব বিন আশরাফের ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে হযরত মোহাম্মদ বিন মাসলামা ﷺ-কে তাওরিয়া করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তিনি যেন ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে এই ইহুদি কা'বের খুব কাছে চলে আসতে পারেন। তো সাহাবি মোহাম্মদ বিন মাসলামা তার নিকট গিয়ে তাওরিয়া করে বললেন, "এই লোকটি—অর্থাৎ নবীজি—আমাদের অনেক কষ্ট দেয়, আবার সদকাও চায়। এখন তো তাকে অনুসরণ করছি, দেখি শেষমেশ কী হয়।" এগুলো ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। আল্লাহর রাসূল তাকে এই কথাগুলো বলার অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি কা'বের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে তাকে খুন করতে পারে। কারণ, এই ব্যক্তি কাফেরদের রাসূলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত, তাই তার এই মৃত্যু মুসলিমদের জন্যে প্রশান্তি বয়ে আনবে।[১৩১]

ওহে পার্লামেন্টপন্থীগণ, এই ঘটনাটি কি আপনাদের বিদ্যমান অবস্থার বৈধতাকে প্রমাণ করে? আপনাদের এই পরিস্থিতি কি মুহাম্মদ বিন মাসলামা ﷺ-এর সাথে মিলে যায়? তিনি—রাসুলের অনুমতিতে—তাওরিয়া করেছিলেন একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে, কুফরের শিকড় উপড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে। এটি করতে গিয়ে এমন কোনো কাজ করেননি, যা ঈমানে ত্রুটি সৃষ্টি করবে, কিংবা শরীয়াহর একক কর্তৃত্বের ব্যাপারে মুসলিমদের অন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। তার এই কাজটি দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের ধোঁকা দেওয়া, মুসলিমদের নয়। তিনি দীনকে এমন রাজনৈতিক কূটকৌশলে পরিণত করেননি, যা জনসাধারণের আস্থায় ভাটা তৈরি করবে।

শুধু এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমেই কি আপনারা রাষ্ট্র নামক ট্রেনটির নেতৃত্বে চলে আসতে পারবেন? নেতৃত্বে আসার পর শরীয়াহ ছাড়া বাকিসব সংবিধান বাতিল ঘোষণা করে দেবেন আর তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেনের দিক পাল্টে ফেলে তাকে শরীয়াহর রাস্তায় নিয়ে আসবেন? বিষয়টি এতই সোজা?

বরং বাস্তবতা হলো, পার্লামেন্টপন্থীগণ এমন সংসদে যোগদান করতে শপথ গ্রহণ করেছেন, যা সংবিধানের আলোকে আইন প্রণয়ন করে। সে সংবিধানের আলোকে, যা জনগণকেই আইন প্রণয়নের একমাত্র হকদার মনে করে, তাদের নামেই আইন

---

১৩১. বিস্তারিত ঘটনা পড়ুন, সহীহ বুখারী: ৪০৩৭।

জারি করে। আর পার্লামেন্টপন্থী ইসলামিস্ট এখানে প্রবেশের পর এই সংবিধানের শক্তিতেই চারদিক দৌড়ঝাঁপ করেন। তাই সংসদে তাদের অংশগ্রহণ মূলত সংবিধানের প্রতি প্রায়োগিক শ্রদ্ধাশীলতা, যার শপথ তারা প্রথম দিন মৌখিকভাবে করেছেন। মুখে যা বলেছেন কাজেও তা বাস্তবায়ন করছেন। কতটা ভয়ংকর! অতএব বোঝা গেল তাদের এ-সমস্ত কর্মকাণ্ড ঈমান ও কুফরের মাঝে চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্যে নয়, আর এই শপথও জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করতে নয়; বরং এর উল্টো। শপথের পর যা করতে হয় তা অকাট্যভাবে হারাম। এরপর মানুষের মাঝে এমন বিভ্রান্তি তৈরি হয় যে, কাফেরদের ধোঁকা দেওয়ার আগেই মু'মিনরাই ধোঁকা খেয়ে যায়।

একটি পরিকল্পিত ও নির্ধারিত পথে ছুটে চলা ট্রেনের নেতৃত্বে আসীন হতে ইসলামপন্থীগণ শপথ গ্রহণ করছেন। অথচ যতক্ষণ ট্রেন গণতন্ত্রের পথে চলতে থাকবে সে ভ্রুক্ষেপই করবে না তার নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তির দিকে। সে গন্তব্যে ছুটে চলবেই। অতএব আবশ্যক হলো গতিপথ পাল্টে দেওয়া, নেতৃত্বের অদল-বদল কোনো কাজই দেবে না।

এই কারণে শপথ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার সময় তার সত্যিকার প্রসঙ্গ ধরে আলোচনা করা উচিত। অর্থাৎ তার গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে যে, এখানে প্রথমে মৌখিক স্বীকৃতি ও পরবর্তী সময়ে প্রায়োগিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এটি বোঝানো হয় যে, ক্ষমতা পার্লামেন্টের, আল্লাহর নয়। এটিও বলে রাখা উচিত, আমাদের সমস্যা শুধু শপথ গ্রহণের ব্যাপারটিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শপথ গ্রহণের মূল প্রেক্ষাপট ও কারণ তার চাইতেও অধিক গুরুতর।

এখন হয়তো অনেকেই বলবেন: কেন বারবার সংবিধানের এই ধারাগুলোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন? এখানে এমন অনেক ভালো ধারাও তো রয়েছে যেগুলোতে মানবতা, স্বাধীনতা, সম্মান ও সমতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। যে এই কথা বলবে তার প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো: আল্লাহর অধিকার তোমার নিকট এতটা নিচু হয়ে গেল! নতুন-পুরাতন সমস্ত জাহেলী মতবাদেই তো স্বাধীনতা, সমতা ও মানবতার মতো চিত্তাকর্ষক স্লোগানগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু কী দরকার আল্লাহর অধিকার খর্ব করে এসব মানবীয় অধিকার অর্জন করার? আল্লাহর ওপর বিন্দু পরিমাণ স্পর্ধাও যদি ভালো কাজের সাগরে ফেলা হয় তাহলে তা পুরো সাগরকে নষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট।

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'আর আপনি ও আপনার পূর্ববতীদের প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছিল যে, 'যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।'[১৩২]

এখন অনেকে অবাক হয়ে বলবেন: শুধু একটি বাক্যের এতবড় শাস্তি! অথচ সাংসদ এই বাক্যটি বললেও তার নিয়ত ভালো ছিল!? প্রিয় ভাই, মনে রাখবেন, ব্যক্তি একটি বাক্য পড়েই মুসলিম হয় আবার এক বাক্যের কারণেই সে কাফের হয়। যে বাক্যে শিরক থাকবে আল্লাহ তার প্রতিক্রিয়া কীভাবে বর্ণনা করছেন দেখুন,

﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾

'যেন এর কারণে আসমানসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার, যমীন খণ্ড-বিখণ্ড এবং পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হওয়ার উপক্রম হয়।'[১৩৩]

আরেকটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিই:

وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِي جَهَنَّمَ

'কখনো বান্দা অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।'[১৩৪]

তারেক ও সালমার গল্প

তারেক নামক এক যুবকের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল সালমার প্রতি। তো সে সালমার বাবার নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু সালমার বাবা তার নিকট চড়া মোহর দাবি করে বসলেন। তারেক চিন্তায় পড়ে গেল, লাভ-ক্ষতির হিসেব কষল। দেখতে পেল যে, মোহর পরিশোধের সক্ষমতা তার আছে। কিন্তু আরও একটি পথ

১৩২. সূরা যুমার: ৬৫।
১৩৩. সূরা মারয়াম: ৯০।
১৩৪. সহীহ বুখারী: ৬৪৭৮।

বাকি আছে যার মাধ্যমে কম খরচে বিয়েটি সেরে ফেলা যায়। পাত্রী, কাজী ও দুজন সাক্ষী উপস্থিত করে তারপর সালমার বাবাকে বাদ দিয়ে সে স্থানে বন্ধু যায়দকে নিয়ে আসলেই তো হলো। যায়দ আবার খুবই ভদ্র ও ধার্মিক। এরপর সবাইকে একত্র করার পর তারেক সালমাকে যায়দের কাছ থেকে তলব করবে, তার বাবা থেকে নয়। কারণ, যায়দ খুব কম মোহরেই রাজি হয়ে যাবে।

ঠিক এভাবেই তারেক ও সালমার বিয়ে সম্পন্ন হলো। তাদের বিয়ে-অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত হলো, অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ শরীয়া-সম্মতভাবেও হলো। অনেক জ্ঞানীগুণী ও শাইখরা এতে অংশগ্রহণ করলেন। এরপর উভয়েই এক ঘরে অবস্থান করতে লাগল, একসাথে রাত কাটাতে লাগল। রাতে তারা একসাথে তাহাজ্জুদ পড়ে, দিনে রোজা রাখে। প্রত্যেক সহবাসের আগে মাসনুন দোয়াও পড়ে। একসময় সন্তানদের কোলাহলে তাদের ঘর ভরে উঠল। তারেক আগের উচ্চমূল্যের মোহর প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণে যে সম্পদ বেঁচে গিয়েছিল সে সম্পদগুলো সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যয় করল।

সংক্ষেপে এটিই হলো তারেক ও সালমার গল্প। এখন আমি কিছু প্রশ্ন করব, উত্তর আপনারাও ভেবে নেবেন।

প্রথম প্রশ্ন: তারেক ও সালমার এই বিয়ে কি শরীয়াহসম্মত হয়েছে?

উত্তর: সহীহ হাদীসে এসেছে, যে নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল বাতিল বাতিল।[১৩৫] অতএব তাদের এই বিয়েটিও অবৈধ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: যায়দ যেহেতু খুবই ভদ্র ও ধার্মিক, তার এই ধার্মিকতার প্রভাব কি তারেক ও সালমার বিয়েতে পড়বে না?

---

১৩৫. তিরমিজি: ১১০২। বিয়ে শুদ্ধ হতে অভিভাবকের অনুমতি শর্ত কি শর্ত নয় সে বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিয়ে শুদ্ধ হতে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তো এতবড় জলজ্যান্ত হাদীসকে কি তারা অস্বীকার করেন? না। হানাফী মাযহাবমতে, এই হাদীসটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত বিষয়ে চার মাযহাবের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, আল মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ: ২৪৭/৪১।
প্রিয় পাঠক, আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, এখানে উল্লেখিত উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে জমহুরের মতের ভিত্তিতে, যাদের মতে বিয়ে শুদ্ধ হতে অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক। তা ছাড়া এই মতটিই শ্রদ্ধেয় লেখক হাফি. এর মাতৃভূমি জর্ডানে প্রচলিত। তাই এই গল্পটি ও এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা এর ভিত্তিতেই আমাদের বুঝতে হবে।

উত্তর: যেহেতু সালমাকে তার অভিভাবকের কাছ থেকে তলব করা হয়নি তাই অভিভাবকের বিকল্প-জন অসৎ নাকি ধার্মিক সেটি আর দেখার বিষয় নয়; বরং যদি ধার্মিক কোনো ব্যক্তি এমন অন্যায় কোনো ভূমিকা আঞ্জাম দেয়, তাহলে তার ধার্মিকতারও কোনো মূল্য নেই। কেননা, তার এই তথাকথিত ধার্মিকতা এই অবৈধ বিয়েকে মিথ্যে বৈধতা দেয়।

তৃতীয় প্রশ্ন: কিন্তু তারেক যে, ইসলামসম্মতভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছে, সহবাসের পূর্বে দোয়া পড়েছে এগুলোর কি কোনো প্রশংসাই করা যাবে না? বিয়ের অনুষ্ঠানে কনসার্ট নিয়ে আসার চাইতে এই অনুষ্ঠানটি কি ভালো ছিল না? রাতে উভয়ের তাহাজ্জুদ পড়া কি অশ্লীল ফিল্ম দেখে রাত কাটানোর চেয়ে ভালো ছিল না? এতসব ইতিবাচক দিককে ছোট করে দেখা প্রান্তিক ও নেতিবাচক মনোভাবের লক্ষণ নয় কি? তাদের জীবনের ইসলামী দিকগুলো আপনাদের নিকট কোনো গুরুত্বই কি রাখে না?

উত্তর: সহীহ হাদীসে এসেছে:

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না।[১৩৬]

তারেক ও সালমার সম্পর্ক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অবৈধ সম্পর্ক। তাই অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত, সহবাসে দোয়া পাঠ এগুলো সবগুলোই হলো আল্লাহর অবাধ্যতা শুরু করার পূর্বে তাকে স্মরণ করার নামান্তর; বরং যদি তারা এই অবৈধ কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া থেকে বিরত থাকত তাহলে গুনাহের পরিমাণ আরও কম হতো! যতক্ষণ তারা এভাবে অবৈধভাবে নির্জন সময় কাটাবে তা তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করলেও গোনাহের কারণ হবে।

চতুর্থ প্রশ্ন: তাহলে সন্তানদের ব্যাপারে কী বলবেন? দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে তারেক তাদের ওপর অজস্র সম্পদ ব্যয় করেছে।

---

১৩৬. সহীহ মুসলিম: ১০১৫।

উত্তর: যেহেতু বিয়ে অবৈধ, তাই সন্তানেরাও অবৈধ। আর তারেক মোহরের সম্পদগুলো দ্বীনি শিক্ষায় ব্যয় করার পরও তার সওয়াব অর্জিত হবে না; বরং সে যদি যথাসময়ে সম্পদগুলো মোহরের খাতে প্রদান করত তাহলে তাদের আজকের এই বিয়ে বৈধ হয়ে যেত।

পঞ্চম প্রশ্ন: ভাবা যায়! তারেক ও সালমার সম্পর্কে সৃষ্ট এই বিপর্যয় শুধু শুরুতে হওয়া একটি ভুলের কারণে? সালমার বাবার কাছ হতে তাকে তলব না করার কারণে?

উত্তর: হ্যাঁ। শুরুর এই একটি ভুলের কারণেই বরকতপূর্ণ শরীয়াহসম্মত বিয়ে ও অবৈধ বিয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। যে কাজের ভিত্তি অবৈধতার ওপর সে কাজটিও অবৈধ।

প্রিয় ভাইয়েরা, পার্লামেন্ট-পন্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারটিও ঠিক এমনই। শরীয়াহকে তার অভিভাবক থেকে তলব না করে অন্য কারও কাছ থেকে তলব করার মতোই। পার্লামেন্ট থেকে শরীয়াহ প্রয়োগের অনুমতি নেওয়ার অর্থ হলো, পার্লামেন্টকে শরীয়াহর ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করা। যদি শরীয়াহর কোনো বিধান প্রয়োগও করা হয়, আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে একে প্রয়োগ করা হবে না; বরং পার্লামেন্ট যেহেতু অনুমতি দিয়েছে তাই প্রয়োগ হবে। যদি ধরেও নিই পার্লামেন্ট পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধান প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তবু এগুলোকে ইসলামী বলা যাবে না, শরীয়াহ বাস্তবায়ন বলা হবে না। কারণ, আইনগুলো প্রকাশিত হবে জনগণের নামে, আল্লাহর নামে নয়। যেভাবে তারেক সালমাকে যায়দ থেকে তলব করেছিল, তার অভিভাবক থেকে নয়।

অতএব পার্লামেন্ট শরীয়াহ প্রয়োগ করতে সম্মত হবে কী হবে না বিষয়টি শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শরীয়াহ প্রয়োগ করতে পার্লামেন্ট যদি অনুমতি দেয় তাহলে সে আইনগুলো থেকে 'আল্লাহর বিধান' পরিচয়টি সরে গিয়ে 'পার্লামেন্টের বিধান' পরিচয়টি যুক্ত হবে।

জনগণের নামে, পার্লামেন্টের অনুমতির সাথে শরীয়াহ যতক্ষণ সম্পৃক্ত থাকবে, তা এক দফায় বাস্তবায়িত হোক কিংবা দফায় দফায় হোক সেগুলো তাগুতের বিধান বলে গণ্য হবে। যদিও-বা বাহ্যিকভাবে দেখতে তা আল্লাহর বিধান মনে হোক-না

কেন। কেননা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারই ইবাদত করা হয় সে-ই তাগুত। এই তাগুতের বৈশিষ্ট্য হলো, আইন প্রণয়নের অধিকার নিজের জন্যে সাব্যস্ত করা ও এর আনুগত্য মানুষদের ওপর অত্যাবশ্যক করা।

এখানে এটি কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়; বরং আল্লাহর দাসত্ব ও বান্দার দাসত্বের মাঝে পার্থক্য করার বিষয়। আপনি ছাগল জবাই করার সময় বললেন: বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)। যদি এভাবে বলেন তাহলে জবেহকৃত জন্তু আপনার জন্যে পবিত্র ও এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করলেন। কিন্তু যদি বলেন: বিসমিশ শাব কিংবা বিসমিল বার্লামান (জনগণ ও পার্লামেন্টের নামে)। তাহলে আপনি শিরক করলেন, এই কথাগুলোর কারণে গুনাহগার হবেন। কারণ, আপনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবেহ করেছেন। এখন জবেহকৃত জন্তুও আপনার জন্যে খাওয়া হারাম হবে।

আল্লাহর নামে কিংবা পার্লামেন্টের নামে যেকোনো একটি বললেই হলো। অনেকেই এভাবে বলেন, ব্যাপারটিতে খুব একটা পার্থক্য করেন না। অথচ এটি তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য। আল্লাহর শাসন ও বান্দার শাসনের মধ্যকার পার্থক্য।

অনেকেরই ধারণা যে, আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা কিংবা পার্লামেন্টের অধীনে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মাঝে খুব একটা পার্থক্য নেই, যেহেতু উভয়টিরই উদ্দেশ্য এক, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ তারা এভাবে বলেন: আমরা যেকোনো পদ্ধতিতেই হোক-না কেন শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কোন পদ্ধতিতে এগিয়েছি বড় কথা নয়, শেষে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কি না সেটাই মুখ্য বিষয়।

অথচ বাস্তবতা হলো, পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা অর্পণ সুস্পষ্ট শিরক; বরং এতে অংশগ্রহণের পর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা হলো কী হলো না সেটাই দেখার বিষয় নয়।

প্রিয় ভাইয়েরা, এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শুনে নিন। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর দাসত্ব নিশ্চিত করতে এটি একটি মাধ্যম-মাত্র। শুধু শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর দাসত্ব নিশ্চিত করা। হাঁ, তবে শরীয়াহর বিধানগুলো সব

আমাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ শুধু চান, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা যেন তার আদেশ পালন করি।

﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾

'আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।'[১৩৭]

অতএব, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। যখন শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা থেকে এই মহান লক্ষ্যটি হারিয়ে যায় তখন আল্লাহর নিকট এর কোনো মূল্যই আর অবশিষ্ট থাকে না।

সেই সাথে আল্লাহ আমাদের থেকে শুধু এটুকুই চান, 'বিধান প্রণয়ন হবে আল্লাহর নামে'। কিন্তু আইন যদি জনগণের নামে বাস্তবায়িত হয় এর সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্কই নেই।

﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

'যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই-না নিকৃষ্ট!'[১৩৮]

আল্লাহ আমাদের কাছ হতে শুধু তাঁর আদেশের আনুগত্য চান। শুধুই তাঁর। আল্লাহর নামেই বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবে—এটাই হলো আল্লাহর চাওয়া।

শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের মূলভাব যেন ফুটে ওঠে। ইসলাম কী? ইসলাম হলো আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, পরিপূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য। আর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করা হবে শুধু এই কারণকে সামনে রেখে যে, এটি আল্লাহর বিধান। এই কারণে না যে, অধিকাংশ জনমত একে সমর্থন করে। আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনুমতি নেওয়া আল্লাহর সাথে স্পষ্টত শিরক। কারণ, এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান মানুষের বিধানে পরিণত হয়।

---

১৩৭. সূরা হজ্জ: ৩৭।
১৩৮. সূরা আনআম: ১৩৬।

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

'তারা যা ফয়সালা করে তা কতই-না নিকৃষ্ট!'

তো যখনই আইন পার্লামেন্টের নামে প্রকাশ পাবে ঠিক তখনই আল্লাহর দাসত্বের অর্থ পরিপূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে। সাংসদ তখন ধার্মিক হলেও কোনো লাভ হবে না, পূর্বের ঘটনায় যায়দের ধার্মিকতা যেভাবে কোনো কাজে আসেনি। সংসদ অধিবেশনের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়লেও কোনো লাভ দেবে না, যেভাবে সহবাসের পূর্বে তারেকের বিসমিল্লাহ কোনো কাজে আসেনি। পার্লামেন্টের অনুমতির পর ইসলামের মূলভাব ফুটিয়ে তুলে আর কোনো কাজ হবে না, সালমার সন্তানেরা যেভাবে বৈধ হয়নি। এভাবে এই পার্লামেন্টের ভালো কাজ ও সিদ্ধান্তগুলোরও প্রশংসা করা যাবে না যেভাবে তারেকের মোহরের টাকা দ্বীন শিক্ষার খাতে ব্যয় করাকে প্রশংসার চোখে দেখা যায়নি। তাই সালমাকে অভিভাবক থেকে তলব না করে যায়দ থেকে তলব করার কারণে তাদের শুরু থেকে শেষ সমস্ত সম্পর্ক অবৈধ সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। কারণ, যার ভিত্তি অবৈধ তার সবকিছুই অবৈধ।

এই কারণে কেউ যখন এই প্রশ্ন করে আমি খুবই বিরক্ত হই, আচ্ছা শাইখ, ধরুন পার্লামেন্ট পদ্ধতিতে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, তখন কি এতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাবে? এই প্রশ্নটি বৈপরীত্যপূর্ণ। প্রশ্নটি অনেকটা এমন: আচ্ছা যায়দ সালমাকে তারেকের সাথে শরীয়াহসম্মতভাবে বিয়ে দিতে সফল হলো, তখন কি তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত ও মতামত পাল্টাবেন? এগুলো অবান্তর প্রশ্ন। কারণ, তাদের এই বিয়ে কোনোভাবেই শরীয়াহসম্মত হবে না, যদি-না তারেক সালমাকে তার বাবার কাছ থেকে তলব করে।

এই মূলনীতি এতটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হওয়ার পরও দুঃখের সাথে বলতে হয়, এটি নিয়ে আলাপ-আলোচনার শেষ নেই। এটি মূলত গণতান্ত্রিক পন্থায় অংশগ্রহণকারী ইসলামপন্থী দলগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যার নেতিবাচক প্রভাব। প্রিয় ভাইয়েরা, এই সিরিজটি তৈরির পেছনে মূল কারণ ছিল, ইসলামপন্থী দলগুলোর এ সমস্ত ভুলের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানুষকে সতর্ক করা। ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে উত্তরণের পথ স্পষ্ট করা।

এই পর্বের সারকথা হলো: শরীয়াহ প্রয়োগ করতে পার্লামেন্টের অনুমতি নেওয়া হলে সেটি আর আল্লাহর বিধান থাকে না, বান্দার বিধানে পরিণত হয়।

গণতন্ত্রের ইসলামীকরণ: যে ক্ষতির কোনো তুলনা হয় না

আজকের এই পর্বটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় থাকবে। আমরা এখানে আলোচনা করব, ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক ভুল থেকে সৃষ্ট আকিদাগত ভ্রান্তি সম্পর্কে। প্রিয় ভাইয়েরা, সিরিজটির এই পর্যায়ে এসে আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এগিয়ে যাব।

প্রথম ধাপে আমরা স্পষ্ট করব, বিভিন্ন ইসলামপন্থীর ভুল রাজনীতি চর্চার কারণে অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে সৃষ্ট আকীদাগত, চিন্তাগত ও পদ্ধতিগত ক্ষতি সম্পর্কে।

এরপর আমরা দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করব। সেখানে আমরা ইসলামপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলব: লাভ-ক্ষতির নীতিকে ব্যবহার করে আপনারা নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোর বৈধতা দিচ্ছেন। আপনারা বলছেন যে, এই পদ্ধতিতে লাভের পরিমাণ ক্ষতির পরিমাণের চাইতে বেশি। প্রথম ধাপে আপনাদের রাজনীতি থেকে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ আলোচনার পর এখন আসুন দ্বিতীয় ধাপে আপনাদের কায়দাটি আবার খাটাই। লাভ-ক্ষতির হিসেব নতুন করে কষি। তখন প্রমাণিত হবে, কিছু ধারণাপ্রসূত কল্যাণ বা লাভের তুলনায় আকীদাগত ও পদ্ধতিগত ক্ষতির পরিমাণ কতটা বেশি। তারপর এও প্রমাণিত হবে, আপনাদের তৈরি নীতি খোদ আপনাদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ দিয়ে বলছে, এই রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ হারাম।

তারপর তৃতীয় ধাপে আমরা বর্ণনা করব, ইসলামপন্থীদের তৈরি লাভ-ক্ষতির এই নীতিকেই আসলে আমরা সমর্থন করি না। কেননা, এই নীতি প্রয়োগের কারণে এমন ভয়ংকর বিচ্যুতি তৈরি হবে, যা ইসলামের মূলনীতিকেই ধসিয়ে দেবে। নতুন এমন একটি ধর্ম তৈরি হবে, যা ইসলাম ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

এখন এই পর্বে আমরা আলোচনা করব, ইসলামপন্থীদের গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ ও বিভিন্নরকম ছাড় প্রদানের দরুন সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে। আর এই প্রভাবগুলো

পড়েছে মুসলিমদের আকীদা ও তার ভাবনায়। মুসলিমদের আকীদায় নেতিবাচক কিংবা ক্ষতিকর প্রভাব বলতে আমরা মূলত কী বোঝাতে চাই? এই ব্যাপারটা আমরা এখানে দ্রুত বলে যাব। সামনের পর্বগুলোতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আসবে।

বহুবছর পশ্চিমা শক্তি ও তাদের সেক্যুলার দোসরেরা চেষ্টা করেও যেসব মূল্যবোধের প্রচলন করতে সক্ষম হয়নি, দুঃখের বিষয় খোদ ইসলামপন্থীরাই সেগুলোর প্রচার-প্রসার এমনকি সেগুলোকে অন্তরে লালন করতে শুরু করেছেন।

প্রচলিত সেসব মূল্যবোধ:

- আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শুধু জনগণের। সে নিজের জন্যে যা ইচ্ছা আইন প্রণয়ন করতে পারে। এমনকি শরীয়াহবিরোধী হলেও জনগণের ইচ্ছাই প্রাধান্য পাবে। জনগণের নিকট যা সত্য, সেটিই সত্য। আর তাদের নিকট যা মিথ্যা, তা-ই মিথ্যা।
- আল ওয়ালা ওয়াল বারা[১৩৯] আকীদার বিনাশ সাধন; বরং মুসলিম ও কাফের সকলেই নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সমান। এমনকি শরীয়াহ যে সমস্ত বিষয়ে জনগণের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে সেগুলোরও কোনো ভিত্তি নেই।
- ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সমতার পায়ে ইসলামকে সঁপে দেওয়া।
- মানুষের অন্তর থেকে এই কথা মুছে দেওয়া যে, ইসলামই হলো একমাত্র সত্য, বাকিসব বাতিল ও মিথ্যা।
- শরীয়াহর অবস্থান মানুষের হৃদয়ে কমিয়ে দেওয়া। আর স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো মূল্যবোধগুলোকে শরীয়াহর চেয়েও প্রাধান্য দেওয়া। এভাবে একসময় স্বভাবজাত প্রকৃতির প্রতি মানুষদের আস্থা কমিয়ে দেওয়া, যে প্রকৃতির মাধ্যমে আল্লাহ মানুষদের শরীয়াহর দিকে ধাবমান করেন।

---

১৩৯. কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা রাখে তাদের ঘৃণা করা, আর মুমিনদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা রাখার নামই হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। ভালোবাসা ও ঘৃণা হবে শুধু আল্লাহর জন্য। কোনো জাতীয়তাকে সামনে রেখে নয়। এটিই হলো এই আকীদার শিক্ষা।

ইসলামপন্থীদের গণতন্ত্র চর্চার নেতিবাচক প্রভাবগুলো এখন আমরা ধীরে ধীরে বর্ণনা করছি, যারা তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন তারা নিচের পয়েন্টগুলোর সত্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন।

- ইসলামপন্থীরা মানবরচিত আইনকে খুব বেশি সহজ চোখে দেখেন, এগুলোকে সমর্থন করেন। তারা তাদের এই অপকর্মকে বুদ্ধিবৃত্তি ও বাস্তবতার নামে চালিয়ে দেন। মানবরচিত সংবিধানকে গ্রহণ করে নেন। শরীয়াহর অনেক বিধানকে তারা অপছন্দ করেন, এমনকি উপহাস করতেও দেখা যায়। তারা মনে করেন সময় ও কাল হিসেবে শরীয়াহর অনেক বিধান বর্তমান সময়ের জন্যে অনুপযোগী। এমনকি অনেকের ধারণা, মানুষের ব্যবহার ও চরিত্র সংশোধনে শরীয়াহ আইনের তুলনায় মানবরচিত আইন অধিক উপযোগী!

- এর কারণে আল্লাহর দাসত্বের অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। 'শাসন শুধু আল্লাহর' এই অর্থটিও হারিয়ে যায়। শরীয়াহর রূপ পাল্টে যায়। এমনকি এই ধারণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, শরীয়াহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। ইচ্ছে করলে গ্রহণ করবে নাহলে না। অনেকেই এই ধারণা করে বসে থাকেন, শরীয়াহকে এই জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে জোড়াতালি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

- মানুষদের মাঝে এর কারণে, নবী-রাসুলদের ওপর মিথ্যা অপবাদ বেড়ে যায়। যেমন তারা বলে, আল্লাহর রাসূল প্রতিক্রিয়ার ভয়েই মূলত হুদায়বিয়াতে সন্ধি করেছিলেন এবং কিছু শাস্তি রহিত করেছিলেন। অনেকেই আবার বলেন নবীগণ দীনের ওপর মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যেমন, হযরত হারুন আ. তাওহীদের ওপর জাতীয় ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেকে আবার তাদের সাথে কুফরী কাজও জুড়ে দেন। যেমন তারা বলে, হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহর বিধানের ব্যতিক্রম শাসন করেছিলেন।

- গণতন্ত্রের আরও একটি প্রভাব হলো, তা জনগণকে শরীয়তের দলিল ও প্রমাণাদির প্রতি অশ্রদ্ধাশীল করে তোলে। প্রত্যেকটি বিষয়কে তখন তারা যুক্তি দিয়ে মাপেন। তাই এখন সালাফীর মোড়কে অনেক সেক্যুলারদের দেখা মিলে।

- গণতন্ত্রের প্রভাবে এই ইসলামপন্থীরা ইসলামের বিদ্রোহী ও জ্বালাময়ী ভাবকে

নষ্ট করে ফেলে। আরব বসন্তের সময়ে তারা মুসলিম যুবকদের উদ্দীপনায় পানি ঢেলে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে, তারা এর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করে দিয়েছিল। যে আঘাতগুলো আমরা আমাদের শত্রুদের থেকে আশঙ্কা করেছিলাম, দুঃখের বিষয় সেগুলো আঞ্জাম দিয়েছিলেন আমাদের এই ইসলামপন্থী ভাইয়েরা।

- এই পন্থায় প্রবেশের পর ইসলামপন্থীরা পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার নামে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠায় গড়িমসি শুরু করে। এমনকি এই পর্যায়ক্রমের ধোঁয়া তুলে গণতন্ত্রের চর্চা ও অনুশীলন তারা আরও বাড়িয়ে দেন। আর এটি হলো গণতন্ত্রের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব।

- ইসলামপন্থীদের গণতন্ত্র চর্চার আরেকটি প্রভাব হলো, জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত নড়ে ওঠার পর তাদের কারণেই এটি আবার শক্তপায়ে দাঁড়াতে পারে। ইসলামপন্থীদের অংশগ্রহণের দরুন মানুষদের অন্তরে গণতন্ত্র ধর্মীয়ভাবে বৈধতা পায়। এই ইসলামপন্থীরাই যেন তাদের নবজীবন দান করে।

- এর কারণে দা'ওয়াত ও দাঈদের ব্যাপারে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দাঈদের তারা সুবিধাবাদী, উপযোগবাদী, কুচক্রী কিংবা বর্ণবাদী ভাবতে শুরু করে। তারা মনে করে দাঈগণ বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ছে দুনিয়ার কল্যাণে, পদের লোভে। এ কারণে অনেক মানুষ তাদের দা'ওয়াত থেকে দূরে সরে যায়।

- ইসলামপন্থীরা এই পন্থায় হীনম্মন্যতায় ভোগেন। হাজারবার বিধর্মী ও সেক্যুলারদের কথা ভাবার পর তবেই বিভিন্ন তৎপরতা ও বক্তৃতা উপস্থাপন করেন, কীভাবে তাদের সন্তুষ্ট রাখা যায় সে চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকেও তারা এদের সন্তুষ্টিকে গুরুত্ব দেন।

- সবচেয়ে মন্দ যে প্রভাব পড়ে তা হলো, ইসলামপন্থীগণ পূর্বোল্লিখিত এতসব ভয়ংকর প্রভাবকে গায়ে মাখান না, এগুলোকে তারা ছোট করে দেখেন। লাভ-ক্ষতির হিসেব কষার সময় এগুলো গুরুত্ব দেন না। এমনকি অনেক আলেম ও দাঈগণ খোদ এগুলোকে তুচ্ছ করে দেখছেন। এই বিষয়টি জনমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। অথচ তাদের এই গুরুত্বহীনতা আকীদার মতো সুরক্ষিত একটি ব্যাপারে।

ওপরে বর্ণিত এতসব নেতিবাচক প্রভাবগুলো তারা লাভ-ক্ষতির মাঝে তুলনা করার সময় ভ্রুক্ষেপও করেন না। অথচ এর প্রত্যেকটির প্রভাব এমন, যার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾

'এই কথাগুলো এমন, যাতে আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়, আর যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পর্বতমণ্ডলী চূর্ণবিচূর্ণ হয়।'[১৪০]

এই বিপজ্জনক প্রভাবগুলোর কোনো একটিকেও যদি লাভ ও কল্যাণের সাগরে মিশানো হয় তাহলে সে একটিই সাগর নষ্ট করতে যথেষ্ট। খুব সংক্ষেপে দুই বাক্যে এই প্রভাবগুলোকে বলা যায়, দীনের বিনাশসাধন! হ্যাঁ, দীনের বিনাশসাধন।

এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ বলবেন: আপনি এই নসীহত তাদের সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে না করে এভাবে সিরিজ আকারে প্রকাশ্যে করছেন কেন? প্রিয় ভাইয়েরা, এই সিরিজ রচনাতে আমাকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বাধ্য করেছে তা হলো, মানুষের আকীদা, বিশ্বাস ও ভাবনায় পরিলক্ষিত ভয়ংকর প্রভাবগুলোই। এসবের পেছনে কিন্তু দায়ী, কিছু ইসলামপন্থীর রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ। যেহেতু এই ভুলগুলো প্রকাশ্যেই হয়েছে, তাই তাদের শোধরাতে গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়া যুক্তিসংগত নয়। আমাদেরও প্রকাশ্যেই তা সংশোধন করতে হবে।

এখন আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, এই সিরিজে 'ইসলামপন্থী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সংক্ষেপণের উদ্দেশ্যে। এই পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা, যারা গণতান্ত্রিক ধারা ও মানবরচিত সংবিধানের আঁচলে আশ্রয় গ্রহণ করে, পার্লামেন্ট ও নির্বাচনের সাহায্যে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা বৈধ মনে করেন। তাদের এতসব ইসলাম-বিধ্বংসী প্রভাব লক্ষ করার পর আমরা নিশ্চয় একে আর সমর্থন করতে পারি না। এই কারণে এখন আমরা 'ইসলামপন্থী' শব্দটি বাদ দিয়ে 'গণতন্ত্রকামী' শব্দটির ব্যবহার শুরু করব।

আরেকটি বিষয়, ইসলামী এমন অনেক দল রয়েছে, যাদের কর্মপদ্ধতিতে সঠিক ও ভুল উভয় প্রকারেরই উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু তারা ছাড় ও গণতন্ত্রের পথ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই সিরিজটি তাদের উদ্দেশ্য করে নয়।

---

১৪০. সূরা মারয়াম: ৯০।

এই পর্বের সারকথা হলো: গণতন্ত্রকামীদের কর্মকাণ্ডে মানুষের আকীদা-কেন্দ্রিক এতটা ক্ষতি হয়েছে, যার বিপরীতে কোনো কাল্পনিক লাভ বা কল্যাণের হিসেব করা যায় না।

আকীদাগত বিভ্রান্তির ব্যাপারে আলেমদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা

গত পর্বে আমরা ইসলামপন্থীদের ভুল থেকে সৃষ্ট আকীদাগত বিভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, তাদের এই কর্মপদ্ধতি থেকে সৃষ্ট ক্ষতি ও অকল্যাণের বিনিময়ে কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না।

আচ্ছা, উলামায়ে কেরাম কি এই ক্ষতি থেকে পূর্বে সতর্ক করেছিলেন? উত্তর হলো, হ্যাঁ। যদিও সে সমস্ত আলেমরা সংখ্যায় খুবই অপ্রতুল ছিলেন। তারা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এমন হওয়া অত্যাবশ্যক, যা মানুষকে আকীদাগত বিভ্রাটে পতিত করবে না। কিন্তু এখন সমস্যা কোথায় হলো? সমস্যা হলো তখন, যখন ভুলভাবে রাজনীতিচর্চা শুরু হলো ও মানুষকে তারা আকীদাগত চূড়ান্ত পর্যায়ের বিভ্রান্তিতে পতিত করল তখন আমরা আলেমদের থেকে যে ভূমিকা আশা করেছিলাম তার বিপরীত ঘটল। আমরা আশা করেছিলাম, উলামায়ে কেরাম তাদের নীতি প্রয়োগ করবেন, তারা এই রাজনীতিকে হারাম ঘোষণা করে মানুষদের এ-থেকে বিরত রাখবেন। আমাদের ধারণা ছিল, তারা এই রাজনীতিবিদদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন, কারণ তাদের ভুলগুলোও প্রকাশ্য, এই ভুলের প্রভাবও দৃশ্যমান। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। তারা এতসব করার বদলে এই বিকৃত রাজনীতি চর্চাকারীদেরই সমর্থন দিয়ে বসলেন! তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন!

এখন মানুষ আকীদাগত বিভ্রাটে পতিত হতে তিনটি বিষয়ই যথেষ্ট হলো: ১. বিপজ্জনক রাজনীতিচর্চা, ২. আলেমদের এই রাজনীতির বিরোধিতা না করা, ৩. বরং এই রাজনীতিবিদদের ভোট দিতে আলেমদের আহ্বান।

এখন আমরা আলেমদের নিকট আবেদন জানাই, তারা যেন তাদের আগের নীতিতে ফিরে যান। আগের মতোই তারা যেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেন যে,

প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এমন হওয়া অত্যাবশ্যক, যা মানুষকে আকীদাগত বিভ্রান্তিতে পতিত করবে না। অতএব প্রিয় উলামায়ে কেরাম, এখন সমাজে আবার চোখ ফিরিয়ে আনুন। দেখবেন সমাজ এই বিভ্রান্তিতে ছেয়ে গেছে। এখন অন্তত এই রাজনীতির বিরোধিতা করুন। এই রোগের চিকিৎসা করুন। এখন আমরা উদাহরণ দেব। একটি উদাহরণ সালাফী আলেমদের নিয়ে, আরেকটি—Muslim Brotherhood—ইখওয়ানের নিকট গ্রহণযোগ্য আলেমদের নিয়ে।

আলেক্সান্দ্রিয়ার সালাফী শাইখ ও মিসরের অন্যতম আলিমে দ্বীন শাইখ মোহাম্মদ ইসমাঈল আল মুকাদ্দাম[১৪১]। এখন আমি তিনি-সহ মিসরের অন্যান্য সালাফী আলেমদের উদ্দেশে কিছু কথা বলব: এখন আমরা প্রকাশ্যে আপনাদের বিরোধিতা করছি। অথচ একসময় আপনাদের ভালোবাসতাম, আপনাদের আলোচনা থেকে শিক্ষা হাসিল করতাম, আপনাদের পক্ষে শত্রুদের আক্রমণের জবাব দিতাম, আপনাদের বিভিন্ন দারস ও উত্তম কর্মকাণ্ড প্রচার করতাম। কিন্তু প্রিয় শাইখেরা, হক আমাদের নিকট আপনাদের চেয়েও অধিক প্রিয়। ওয়াল্লাহি! হকের দিকে আপনাদের প্রত্যাবর্তন দুনিয়ার চাইতেও আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। যদি ফিরে আসেন আমরা আপনাদের দা'ওয়াতের খাদিমে পরিণত হব। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, এই বিপজ্জনক বিষয়টির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, উম্মাহকে সে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, যার কিছু দোষ আপনাদের ওপরও বর্তায়। ইয়া আল্লাহ, যদি আমার এই দাবি সত্য হয় তাহলে একে গ্রহণ করুন। আর যদি তা মিথ্যা হয়, তাহলে এগুলো কবরে দাফন করুন।

আরব বসন্তের পূর্বে শাইখ মুকাদ্দাম পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকে হারাম বলতেন। তবে তিনি এই বিষয়টিকে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় মনে করতেন। তবুও লক্ষ করুন বিষয়টি মতানৈক্যপূর্ণ হওয়ার জন্যে তিনি কত শর্ত দিয়েছিলেন,

শাইখ মুকাদ্দাম বলেন: পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করতে নিজের আকীদাকে বিসর্জন দেওয়া জায়েয হবে না। তবে জায়েয হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, কোনোরকম ছাড়

---

১৪১. ২০১৩ এর আগ পর্যন্ত শাইখ মুকাদ্দাম হাফি. ছিলেন মিসরের সবচেয়ে তৎপর সালাফী আলেম। সমসাময়িক প্রায় সব ফিতনা মোকাবিলায় তার দারসগুলোর কারণে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ২০১২ তে মিসরের একমাত্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি মুরসিকে সমর্থন দেন। কিন্তু ১৩ তে গিয়ে যখন সিসির নেতৃত্বে সেনাবিদ্রোহ ঘটল তিনি পর্দার পেছনে চলে গেলেন। এই যুগকে ফিতনার যুগ আখ্যা দিয়ে নিভৃত জীবনযাপনে মনোযোগ দিলেন।

না দেওয়া ও রাজনৈতিক কূটকৌশলের আশ্রয় না নেওয়া। কারণ, রাজনৈতিক এই কূটকৌশলগুলো আকীদা ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ে, বিষয়টি তখন তাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে যায়, আকীদা-কেন্দ্রিক মৌলিক বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾

'আপনি তাদের মাঝে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।'[১৪২]

লক্ষ করুন এই আয়াতের পর আল্লাহ কী বলেছেন,

﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

'তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যাতে আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা এর কোনো কিছু হতে আপনাকে বিচ্যুত না করে।'[১৪৩]

অতএব দীনের মৌলিক বিষয়ে ছাড় প্রদান করা কিংবা এমনভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যা দীনের বুঝকেই পাল্টে দেবে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড অনেক বড় অপরাধ ও বিচ্যুতি, যা ব্যক্তির ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তোলে।[১৪৪]

শাইখ হাফি. একেবারেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। তাওহীদ রক্ষায় এর চেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আর হতে পারে না। এখন আসুন এই বক্তব্য থেকে আমরা কিছু শিক্ষা বের করি,

> ১. শাইখ হাফি. স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, রাজনৈতিক কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়া নাজায়েয।

কেমন রাজনৈতিক কূটকৌশল? অর্থাৎ, এমন কোনো বক্তব্য, যা আল্লাহর দাসত্ব ও শাসনক্ষমতার ব্যাপারে বিভ্রান্তি তৈরি করবে। যেমন, রাজনৈতিক বক্তব্যের দোহাই দিয়ে এই কথা বলা যে, ইচ্ছেমতো আইন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার জনগণের

---

১৪২. সূরা মায়েদা: ৪৯।

১৪৩. প্রাগুক্ত।

১৪৪. সিরিজ: হাউলা দুখুলিল বার্লামান। https://audio.islamweb.com/audio/index.php?page=FullContent&audioid=১৬৩৩৮৭

আছে কিংবা জনগণের হৃদয় জয় করতে ও শত্রুকে ঘায়েল করতে এই কথাগুলো বলা যায়।

ড. মোকাদ্দাম নিশ্চিত করে বলেছেন, এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। কেন?

তিনি বলেন, কারণ রাজনৈতিক এই কূটকৌশলগুলো আকীদা ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ে। বিষয়টি তাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে যায়। আকীদা-কেন্দ্রিক মৌলিক বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়।

২. শাইখ মোকাদ্দাম আকীদার বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাকে অনেক বড় অপরাধ ও বিচ্যুতি বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা ব্যক্তির ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

আমি যখন বলি, ইসলামপন্থী দলগুলোর কর্মকাণ্ড কখনোই গ্রহণযোগ্য ইজতেহাদ কিংবা অনুমোদিত মতানৈক্য হতে পারে না, তখন অনেকেই আমার এই কথাকে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু লক্ষ করুন শাইখ মোকাদ্দাম—পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের বিষয়কে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় বললেও—মানুষকে বিভ্রান্ত করার বিষয়টিকে অনেক বড় অপরাধ ও বিচ্যুতি বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা কোনো মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় নয়; বরং এর কারণে ব্যক্তির ঈমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এখন ড. মোকাদ্দাম যাকে নির্বাচিত করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তার নির্বাচন-পরবর্তী বক্তব্য শুনে শাইখের কী অবস্থান হবে বলে আমরা ধারণা করতে পারি?

নির্বাচিত ব্যক্তি তার প্রথম বক্তব্যেই বললেন: আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মিসরের মুসলিম ও খ্রিষ্টানেরা!... ওহে মহান জাতি, আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনারাই হলেন ক্ষমতা ও বৈধতার একমাত্র উৎস। আপনাদের বৈধতার ওপর আর কোনো বৈধতা নেই। আপনারাই ক্ষমতার মালিক ও এর উৎস। বৈধতা দেওয়ার ক্ষমতা শুধু আপনাদেরই রয়েছে।

তিনি আরও বললেন: আমি আপনাদের নিকট নির্বাচিত হয়ে এসেছি, কারণ ক্ষমতা ও বৈধতার সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস হলেন আপনারাই। আপনাদের ইচ্ছার ওপর কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দল ও মতের শক্তি নেই। জনগণ ক্ষমতার একমাত্র উৎস। তারাই শাসন করবে, সিদ্ধান্ত নেবে কিংবা প্রয়োজন পড়লে বরখাস্ত করবে।

তিনি আরও বললেন: এই ক্ষমতার ওপর কারও ক্ষমতা নেই। আপনারাই হলেন একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী। আপনারাই যা ইচ্ছা করবেন, যা থেকে ইচ্ছা বাধা দেবেন।

আপনারাই যা ইচ্ছা করবেন, যা থেকে ইচ্ছা বাধা দেবেন! তার এই বক্তব্য আমাকে হানী আন্দালুসীর একটি কবিতা স্মরণ করিয়ে দিল। ফাতেমী খলীফা মুইজ লিদিনিল্লাহর তোষামোদ ও প্রশংসা করতে সে বলেছিল:

ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ
فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ

আপনার ইচ্ছা আর তাকদিরের চাওয়ায় কোন পার্থক্য কি আছে?

ক্ষমতা যেহেতু আপনার, আপনি ছাড়া প্রতাপশালী আর কেইবা হবে?[১৪৫]

তারপর জনগণের ক্ষমতা জনগণ থেকে নিয়ে তার নিকট অর্পণ করার বিষয়টিকেও যেন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন: ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকার অর্থ এই নয় যে, আমরা আইনের প্রতি সম্মান দেখাব না; বরং সংবিধান ও বিচারব্যবস্থাকে আমরা সব সময়ই সামনে রাখব।

তিনি তার বক্তব্য শেষ করলেন এভাবে: আমরা আইন, সংবিধান ও জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব। আর মিসরের মহান আদালত কর্তৃক দেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেব।[১৪৬]

"আমরা সংবিধান, জনগণের ইচ্ছা ও আইন প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।" কোন আইন? নিশ্চয় সে আইন, যা মানবরচিত। কোন সংবিধান? সে সংবিধান, যার তৃতীয় ধারায় বলা আছে, ক্ষমতা শুধু জনগণের। তারাই ক্ষমতার মূল উৎস। "মিসরের মহান আদালত কর্তৃক দেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত"। কোন সে আদালত? যে আদালত আল্লাহর দেওয়া বিধানের বিপরীত ফয়সালা করে।

---

১৪৫. দিওয়ানু ইবনে হানী: ৬২।
১৪৬. এটি নির্বাচিত হওয়ার পর তাহরীর স্কয়ারে দেওয়া প্রেসিডেন্ট মুরসির প্রথম বক্তব্য। আল আখবার পত্রিকা: https://al-akhbar.com/Arab/৭১৮১৯

এই বক্তব্যে জনগণকে প্রভুর আসনে বসানো হলো, তাদের আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হলো, আর শরীয়াহ শব্দটি একটি বারের জন্যেও উচ্চারিত হলো না। হ্যাঁ, শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত হয়েছিল, যেভাবে আগের অন্যান্য অনৈসলামী শাসকগণও তিলাওয়াত করতেন। আয়াতের মাধ্যমে বক্তব্যকে সাজানো এক কথা, সে অনুযায়ী আমল করা আরেক কথা।

বক্তব্যের শুরুতেই স্থান পেল খ্রিষ্টানদের কথা। মুসলমানদের সাথে সাথে ক্ষমতা ও বৈধতার অধিকার তাদের জন্যেও সাব্যস্ত করা হলো। স্পষ্টভাবে হোক কিংবা অস্পষ্টভাবে, শরীয়াহকে একটিবারের জন্যেও উল্লেখ করা হলো না! মানবরচিত আইন ও সংবিধানকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো, অথচ শরীয়াহর নামগন্ধ পর্যন্ত সেখানে নেই!

যেহেতু ইঙ্গিতেও শরীয়াহর কথা বলা হয়নি, তাই জনগণের এই ধারণা হবে যে, তারা ইচ্ছেমতো আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখেন। তারাই সার্বভৌমত্ব ও বৈধতার একমাত্র অধিকারী।

এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের ব্যাপারে আরব বসন্তের পূর্বে শাইখ ইসমাঈল মোকাদ্দম কী বলেছিলেন দেখুন: "খোলাসা কথা হলো, এই বিষয়টি আকীদাগত সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়। সার্বভৌমত্ব হয়তো শরীয়াহর থাকবে, নয়তো জনগণের থাকবে। হয়তো আইন প্রণয়নের অধিকার শুধু আল্লাহর থাকবে আর জনগণের ভূমিকা শরীয়াহর মূলনীতি ও ইজতিহাদের আলোকে প্রত্যেকটি বিষয়ে বিধান তৈরি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যাতে তা আল্লাহর দীন অনুযায়ী হয়, আর এটিই হলো ইসলাম। নয়তো আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহকে বাদ দিয়ে পার্লামেন্ট বা অন্য কারও জন্যে সাব্যস্ত করা হবে। তারা যা ইচ্ছা বৈধ করবে, যা ইচ্ছা অবৈধ করবে, শরীয়াহর কোনো বিধান চাইলে বাকি রাখবে, পছন্দসই না হলে ছুড়ে ফেলবে, কাউকে বৈধতা দেবে, কারও কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবে। যুগ যুগ ধরে উম্মাহর সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। এটি এমন অবৈধ একটি বিষয়, কোনো ধরনের সংস্কার বা পরিবর্তন এর অবৈধতাকে বৈধ করতে সক্ষম হবে না।

এই কথার সাথে আমি আপনাদের আগে বর্ণিত তারেক ও সালমার উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাদের বিয়ে এমনভাবে অবৈধ ছিল, যা কোনোভাবেই বৈধ করা সম্ভব নয়।

শাইখ আরও বলেন: যে শাসনের মূলভিত্তি পার্লামেন্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার ওপর গঠিত, সে শাসন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। তার সমস্ত আইন-কানুন সম্পূর্ণরূপে বাতিল। সমাজের অপরাধগুলো থেকে নিষ্কৃতি পেতে যদি ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো কাফের রাষ্ট্র কিছু ইসলামী দণ্ড প্রয়োগ করে সেটি কি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে?

তিনি আরও বলেন: এখন মানুষের ওপর শরীয়াহর কিছু আইন চাপিয়ে দিয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; বরং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার সূচনা হতে হবে, সমাজের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া একটি বড় বিকৃতিকে সংস্কার করার মাধ্যমে। আর সে বিকৃতিটি হলো, ইসলামী শরীয়াহকে বাদ দিয়ে পশ্চিমা-নীতিতে সার্বভৌমত্ব জনগণ কিংবা জনপ্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তর করা।

শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি আমাদের শুরু করতে হবে এই প্রশ্ন দিয়ে যে, আজ রাজত্ব কার? পার্লামেন্টের না কুরআনের? কুরআন-সুন্নাহর নাকি জনগণের ইচ্ছার?

শুরু থেকে এই প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে, এই বিষয়টি স্পষ্ট না হলে, জনগণ ধোঁকা ও বিভ্রান্তিতে পতিত হবেন। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সংস্কারবাদী কর্মকাণ্ড নিছক জোড়াতালি বলেই গণ্য হবে। যা দুনিয়া আখেরাতে কোনো কল্যাণই বয়ে আনবে না।"

শাইখ এভাবে তার কথা শেষ করেন। হাফিজাহুল্লাহ। একেবারে সুস্পষ্ট ও প্রমাণাদিতে ভরপুর বক্তব্য।

এখন আমরা শাইখ মোকাদ্দামকেই উদ্দেশ্য করে বলব: শাইখ, এখন ইসলামপন্থীরা তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট করেছে যে, তারা জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। এই কারণে এমন আকীদাগত বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে যে, আপনার ভাষ্যমতে এই ক্ষতি অপূরণীয়। তবু আপনারা তাকে মন্দের ভালো আখ্যা দিয়ে সমর্থন দিতে লাগলেন! অথচ এই কথাগুলো একসময় বিস্মৃত হয়ে যাবে। তখন মানুষের হৃদয়ে ও ইতিহাসের পাতায়

পাতায় এই কথাই শুধু লেখা থাকবে যে, সালাফী শাইখগণ এই প্রেসিডেন্টকে সমর্থন দিয়েছিল। যখন আমরা ভোটদান হারাম বলেছিলাম তখন আমাদের বিরোধী পক্ষ এই কথা বলে যুক্তি দিচ্ছিল যে, সালাফী শাইখদের দেখো। তারা তো এই লোককে সমর্থন দিয়েছেন।

এভাবেই মানুষের অন্তরে আপনাদের সমর্থনের কথা গেঁথে থাকবে। এতসব ব্যাখ্যা মনে থাকবে না। যে প্রেসিডেন্সিয়াল বক্তব্যে আল্লাহর কোনো অংশই ছিল না, সে বক্তব্য আপনাদের সমর্থনের কারণে মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

আচ্ছা যা হওয়ার হয়েছে। আপনারা তাকে সমর্থন দিয়েছেন। এখন অন্তত আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিন। আল্লাহর নিকট তাওবা করুন। মানুষের মাঝে এই কথা প্রচার করুন যে, আপনারা আগের বক্তব্যের সাথে একমত নন। এখনো আমরা বিভিন্ন আলেমের ওয়েবসাইটে চোখ ঘুরিয়ে আনি। আমরা তাদের কাছ থেকে এই বক্তব্যগুলোর কোনো ধরনের সমালোচনা পাই না। বড়ই অপ্রীতিকর ও আশ্চর্যজনক দৃশ্য।

বরং অনেক সালাফী শাইখ এই ইসলামপন্থী দলকে সমর্থন দিয়েছেন। তাদের বৈধতা নিশ্চিত করেছেন। সালাফের নিকটবর্তী দল বলেও তাদের আখ্যা দিয়েছেন! কিন্তু যখন এই দলটিই জনগণের ক্ষমতায়নের মূলনীতি পেশ করে সংবিধান তৈরিতে সকল মত-পথের লোকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল তখন তাদের কাউকে আর বিরোধিতা করতে দেখা গেল না। যখন এই দলটি সংবিধানের বিকৃত ইসলামী ধারাটিকে আপন অবস্থায় রেখে দিল তখনো এই সালাফী শাইখেরা তাদের সমর্থন থেকে পিছু হটেননি।

এই পর্বের সারকথা হলো শাইখ মোকাদ্দামেরই দুটি বাক্য, রাজনৈতিক কূটকৌশল আকীদা ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ে। দীনের মৌলিক বিষয়ে ছাড় প্রদান করা কিংবা এমনভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, যা দীনের বুঝকেই পাল্টে দেবে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড অনেক বড় অপরাধ ও বিচ্যুতি। যা ব্যক্তির ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

আলেমদের অন্ধ অনুকরণ

গত পর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, পার্লামেন্টে ইসলামপন্থীদের অংশগ্রহণের দরুন আকীদাগত বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার ব্যাপারে কিছু কিছু আলেম আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তারপর আমরা বলেছিলাম, এই বিভ্রান্তি বাস্তবে তৈরি হয়েছে। এখন আলেমদের দায়িত্ব হলো, বিভ্রান্তিকর এই রাজনীতিকে হারাম ঘোষণা করা। আমরা আরও বলেছিলাম, পার্লামেন্টভিত্তিক দল কিংবা এই ধরনের কোনো প্রেসিডেন্টের প্রতি আলেমদের সমর্থন আকীদাগত বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি করবে। এই কথাগুলো বোঝাতে আমরা সালাফী আলেমদের থেকে শাইখ ইসমাঈল আল মোকাদ্দাম হাফি. এর বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলাম। শাইখের আরব বসন্ত তৈরি হওয়ার আগের একটি বক্তব্যকে আমরা পরবর্তী অবস্থার সাথে তুলনা করেছি।

এখন আসুন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের—Muslim Brotherhood—আস্থাভাজন আলেমদের একজন শাইখ আব্দুল মাজেদ শাযেলীর বক্তব্য আমরা আলোচনা করি। তিনি প্রথমে ইখওয়ানের সাথে থাকলেও পরবর্তী সময়ে সাইয়েদ কুতুব ﷺ এর চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

তিনি বলেন: প্রত্যেক ইসলামী সংগঠনের কর্তব্য হলো, আকীদাগত বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি থেকে বিরত থাকা; বরং তার দায়িত্ব হলো, আকীদাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ও এ-সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করা।

তিনি আরও বলেন: এই সংগঠন ও আন্দোলন তো কেবল দা'ওয়াতের সেবক। তাদের কাজ হলো মানুষের অন্তরে সঠিক আকীদাকে দৃঢ় করে বসিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ, ইসলামী সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের আকীদা ঠিক করা। তাতে বিভ্রান্তি তৈরি করা নয়।

আরও বলেছেন: এই কারণে প্রত্যেক ইসলামী সংগঠনের ওপর কর্তব্য হলো, কঠিন আকীদাগত বিষয়গুলো স্পষ্ট করা ও সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কোনোভাবেই স্বীকার না করা। এই সংগঠনগুলো যেন আকীদার বিপক্ষ-শক্তিতে পরিণত না হয়; বরং ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সমস্ত সংগঠনগুলোর আকীদা ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া উচিত। যেন বন্ধুর সাথে সাথে শত্রুর সামনেও তাদের বিষয়টি স্পষ্ট থাকে।

এই কথাটি লক্ষ করুন। আল্লাহর শাসন, তাঁর দাসত্ব ও মানবরচিত সংবিধানের বিষয়ে গণতন্ত্রপন্থীদের ভয়ংকর ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য আলোচনার সময় এই কথাটির আমাদের প্রয়োজন পড়বে। যদিও তাদের এই বক্তব্যকে অনেকেই নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। যেন রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে শরীয়াহ খুব বেশি ধরপাকড় করে না, কারণ এর মাধ্যমে শত্রুকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্য থাকে!

"ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সমস্ত সংগঠনগুলোর আকীদা ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া উচিত, যেন বন্ধুর সাথে সাথে শত্রুর সামনেও তাদের বিষয়টি স্পষ্ট থাকে।" শায়েলীর এই বক্তব্য শাইখ মোকাদ্দমের আগের বক্তব্যটির মতো: "বৈধতার অন্যতম শর্ত হলো, কোনোরকম ছাড় না দেওয়া ও রাজনৈতিক কূটকৌশলের আশ্রয় না নেওয়া। কারণ, রাজনৈতিক এই কূটকৌশলগুলো আকীদা ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ে।"

শায়েলী আরও বলেন: বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী সংগঠনগুলো নিজেদের মৌলিক আকীদার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছে না; বরং অনেক সময় এগুলোকে তারা অস্বীকার করছে। তাদের যে সমস্ত বক্তব্য মানুষের নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজন ছিল তা পৌঁছাতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এমন-সব বিভ্রান্তি তারা তৈরি করেছেন, যার মাধ্যমে খোদ উম্মাহর পুনর্জাগরণ আন্দোলন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।"

তিনি নিশ্চিত করছেন যে, এই সংগঠনগুলো আকীদাগত মৌলিক বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে, এমনকি উম্মাহর পুনর্জাগরণ আন্দোলন তাদের কারণে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই কথাগুলো পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলের উদ্দেশ্যে যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কার উদ্দেশ্যে হতে পারে!

তারপর তিনি আরও বলেছেন: আকীদাগত বিভ্রান্তি, প্রচণ্ড দুর্বলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও অস্পষ্টতা নিয়ে এই ধরনের জালিয়াতিপূর্ণ নির্বাচন থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অত্যাবশ্যক। এখন কর্তব্য হলো হককে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা, তাওহীদের সঠিক বুঝ প্রচার করা ও আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করা। এর মাধ্যমেই একমাত্র উম্মাহর পুনর্জাগরণ সম্ভব।[১৪৭]

---

১৪৭. আল খিতাব আদ দীনি ওয়াল খিতাব আস সিয়াসী: ২। https://ahlusunnah.org/node/37953?page=3

তার এই বক্তব্য শাইখ মোকাদ্দামের আগের সে বক্তব্যটির ন্যায়: এখন মানুষের ওপর শরীয়াহর কিছু আইন চাপিয়ে দিয়ে—পার্লামেন্ট পদ্ধতিতে—শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; বরং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার সূচনা হতে হবে, সমাজের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া একটি বড় বিকৃতিকে সংস্কার করার মাধ্যমে। আর সে বিকৃতিটি হলো, ইসলামী শরীয়াহকে বাদ দিয়ে পশ্চিমা-নীতিতে জনগণ কিংবা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের মূলনীতি।

অতএব উভয় শাইখের বক্তব্য থেকে এই কথা স্পষ্ট যে, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, হককে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা, তাওহীদের সঠিক বুঝ প্রচার করা ও আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করা। আর সমাজের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া 'জনগণের ক্ষমতায়ন' নামের বড় বিকৃতির সংস্কার করা। আমি মনে করি আমাদের এই সিরিজটি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাচ্ছে।

তো অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, শাইখ শাযেলী স্বয়ং এখন মিসরের পার্লামেন্ট নির্বাচনের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি এবং তার সংগঠন জামায়াতুদ দা'ওয়াহ মুরসীকে ভোট দিতে মানুষের ধারে ধারে ভিক্ষা করছেন। তারা মনে করছেন, মুরসী শরীয়াহকে কোনোভাবেই বিকৃত করছেন না; বরং তাদের ভাষায়, মুরসী শরীয়াহকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে!

আমরা শাইখ শাযেলীকে উদ্দেশ্য করে বলব: মুরসীর সুস্পষ্ট কিছু বক্তব্য আমরা লক্ষ করেছি। তিনি সেখানে জনগণের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকে সমর্থন করেছেন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে বৈধতা দেওয়ার মালিক ঘোষণা করেছেন। মানবরচিত আইন ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আমরা লক্ষ করেছি তার বক্তব্যগুলোতে শরীয়াহ প্রায় অনুল্লেখিত ছিল। এমনকি একজন ইসলামী প্রার্থীকে জয়ী করার পরও তিনি সংবিধান রচনায় সব মতপথের লোকের সাহায্য নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন!

শাইখ, ইতিপূর্বে আপনি দুই জন প্রার্থীর সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তারা বলেছিল, 'আমরা শরীয়াহর মূলনীতিগুলো গ্রহণ করব। শরীয়াহর অন্যান্য শাখাগত বিধান ও উদ্ধৃতিকে নয়।' অথচ বর্তমান প্রেসিডেন্টকে দেখা যাচ্ছে তিনিও তার নির্বাচনী প্রচারণায় স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন, শরীয়াহ বলতে শরীয়াহর

মূলনীতিগুলোকেই তিনি আঁকড়ে ধরবেন। এখন কেন আপনি আর বিরোধিতা করছেন না? আপনার বর্ণিত, হককে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা ও তাওহীদের সঠিক বুঝ প্রচার করার মূলনীতি এখন কোথায় গেল?

প্রিয় শাইখ শায়েলী, আপনার নতুন লেখাগুলোতে কেন এই পদ্ধতির কোনো ধরনের বিরোধিতা এখন দেখতে পাওয়া যায় না? বরং শুধু নিঃশর্ত সমর্থন আমরা দেখতে পাই। এখন আপনি কথা বলেন পার্লামেন্ট নতুন করে সাজানোর ব্যাপারে, অমুক-তমুক শাখাগত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে। যেখানে মৌলিক বিশ্বাসই বিভ্রান্তিতে নিপতিত সেখানে এই ধরনের কথাগুলোর কোনো মূল্যই তো থাকে না। আপনিই তো আমাদের শিখিয়েছেন, আকীদাগত বিভ্রান্তির সময়ে পার্লামেন্ট পদ্ধতি পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

প্রিয় ভাইয়েরা, আকীদাগত বিভ্রান্তি তৈরি হারাম বিষয়ে আলেমদের আগের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। আর জনমনে সে বিভ্রান্তি যে সত্যই সৃষ্ট হয়েছে তা আমাদের নিকট সামনের আলোচনাগুলো থেকে আরও স্পষ্ট হবে। আমরা আমাদের আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা প্রমাণ করব।

এখন আমাদের সামনে দুটি বিকল্প। প্রথমটি হলো, হয়তো বলতে হবে: আলেমগণ আমাদের চাইতে অধিক অবগত। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা বাস্তবতা সম্পর্কে অধিক ধারণা রাখেন। তাই হতে পারে, তাদের সামনে এমন কিছু ধরা দিয়েছে, যা আমাদের নিকট ধরা দেয়নি। আমরা তো আর বেশি বুযুর্গ কিংবা দীনের ব্যাপারে তাদের চাইতে অধিক আগ্রহী হতে পারি না! দাওয়াতের ময়দানে তাদের একজনের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের চেয়ে বেশি! তাদের ভুল ধরতে যাওয়ার আমরা কে!?

প্রিয় ভাইয়েরা, ঠিক এইভাবে চিন্তার কারণে আমরা সুফিবাদের সমালোচনা করি। কারণ, তারা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি পীর সাহেবের কাছে বন্ধক দিয়ে দেন। তারা ভাবেন, পীর সাহেব আল্লাহর ভাষায় কথা বলেন, পীর সাহেবের দেখানো পথই একমাত্র সঠিক পথ।

যদি আবু বকর ও উমর রা. মানুষের নিকট ভুল করে থাকলে শুধরে দেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন, তাহলে আলেমরা কেন এর ঊর্ধ্বে হতে যাবেন? মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করো—যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো।'[১৪৮]

দেখুন আল্লাহ নিঃশর্ত আনুগত্য শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই নির্ধারিত করেছেন। বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।'

এরপর বলেননি যে:

وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের আনুগত্য করো।'

বরং শুধু বলেছেন:

﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।'

অর্থাৎ, যারা বিচারক—এর মধ্যে আলেমগণও শামিল—তাদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে।

---

১৪৮. সূরা নিসা: ৫৯।

তারপর আল্লাহ তাআলা আলেমদের সাথে মতপার্থক্য তৈরি হলে কর্মপদ্ধতি কেমন হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

'যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করো।'[১৪৯]

তাই আমাদের কর্তব্য হলো, দলিলের অনুসরণ করা। এর মাধ্যমেই আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পদ্ধতি থেকে নিজেদের পৃথক করতে পারব।

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করে।'[১৫০]

পণ্ডিতেরা তাদের ইচ্ছেমতো প্রতিটি বিষয়কে হালাল কিংবা হারাম করে। আর ইহুদি-খ্রিষ্টানেরা তাদের সেসব বিষয়ে প্রশ্নাতীতভাবে আনুগত্য করে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে আনুগত্য শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো—যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটিই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।'[১৫১]

অতএব এখন যেহেতু প্রথম পথকে গ্রহণ করা যাচ্ছে না তাই দ্বিতীয় পথকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের বলতেই হবে: আলেমগণ ভুল পথে হেঁটেছেন। যারা এই রাজনীতি-চর্চা করতে গিয়ে মানুষের আকীদাকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের সমর্থন দিয়ে আলেমগণ ভুল করেছেন। তারপর এসব ভ্রান্তি দেখার

---

১৪৯. প্রাগুক্ত।

১৫০. সূরা তাওবাহ: ৩১।

১৫১. সূরা নিসা: ৫৯।

পরও চুপ করে থেকেও তারা ভুল করেছেন। আমাদের আল্লাহ চোখ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কান দিয়েছেন শুনতে পাচ্ছি আর বুদ্ধি দিয়েছেন দলিলের মাধ্যমে যাচাই করতে পারছি।

এই পর্বের সারকথা হলো শাইখ শায়েলীরই একটি বক্তব্য: প্রত্যেক ইসলামী সংগঠনের কর্তব্য হলো, আকীদাগত বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি থেকে বিরত থাকা; বরং তার দায়িত্ব হলো, আকীদাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ও এ-সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করা।

শিরকের পথ বন্ধ করা অধিক প্রয়োজনীয় নয় কি?

ইসলামের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, সাদ্দুয যারায়ে—হারাম কাজের পথ বন্ধ করা। অর্থাৎ এর নিয়ম হলো: যে সমস্ত কথা কিংবা কাজ হারামের দিকে ঠেলে দেয়, হারাম কাজের পথ খুলে দেয়, সে সমস্ত কথা বা কাজকেও হারাম ঘোষণা করা। যাতে হারামের পথ বন্ধ থাকে।

সতর্কতাস্বরূপ উলামায়ে কেরাম এই মূলনীতিটির পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ তারাই যখন পার্লামেন্ট পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করলেন তখন অধিকাংশ আলেমই এই যুগের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয়ে এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করেননি। অর্থাৎ, আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন, জনগণের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র মতো গুরুতর বিপজ্জনক বিষয়ে। তারা এই হারামের পথকে তো বন্ধ করেনইনি, উপরন্তু এর পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই পর্বে আমরা আলেমদের এই মূলনীতিটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তা প্রয়োগের আহ্বান জানাব।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আমরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকৃত রাজনীতির সমালোচনা করছি, সেটি আসলে হারামের মাধ্যম নয়; বরং এটি নিজেই হারাম। এমনকি এখানকার অনেক বিষয় ঈমানবিধ্বংসী। তবু কেন আমরা হারামের মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করছি? উলামা ও দাঈদের এই বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে: আপনারা হারামের দিকে নিয়ে যায় এমন মাধ্যমকে পর্যন্ত যেখানে হারাম ঘোষণা করছেন সেখানে একটি পুরোদস্তুর হারাম বিষয়ের ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? বিশেষ করে আমরা কোনো ছোটখাটো হারামের ব্যাপারে বলছি না, কথা বলছি

কবীরা গুনাহের ব্যাপারে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরকের ব্যাপারে, আল্লাহর দাসত্বের অর্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। এসবের দিকে মানুষকে আহ্বান করা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের কি উচিত নয় এসব বর্জন করা? মানুষের সামনে এর ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করা? আপনাদের এতসব কর্মকাণ্ড জনগণের মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতি বৈধতার সিল মেরে দিচ্ছে।

আবার বলি, বিভিন্ন ঘরানার ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মানুষকে আকীদাগত বিভ্রান্তিতে পতিত করেছে। এখন আমরা ইসলামপন্থীদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডগুলো উপস্থাপন করব। তারপর আলেমদের উদ্দেশে বলব: এ সমস্ত বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড সব সময়ের জন্যে হারাম। যারা বলছেন ও করছেন তাদের আকীদা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হলেও আল্লাহ্ এগুলোকে হারাম করে রেখেছেন। কারণ, একসময় তা আকীদাগত বিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া এই সময়ে তো বিকৃতি বাস্তবেই দেখা দিয়েছে।

আমরা উলামা ও দাঈদের আরও বলব: যেখানে ছোটখাটো গুনাহ্ থেকে বাঁচতে আপনারা মাধ্যমকেও হারাম করার মূলনীতির ওপর অটল আছেন সেখানে শাসন, আইন প্রণয়ন ও গণতন্ত্রের মতো গুরুতর বিষয়ে আপনাদের এই মূলনীতি কই গেল? ছোটখাটো গুনাহ্ তো ক্ষমা করার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা হয় না।

দেখুন, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বান্দা হিসেবে সম্বোধন করেছেন, যাতে নবীর সম্মানে বাড়াবাড়ির মাধ্যমকে বন্ধ করে দেওয়া যায়। তিনি তাঁর নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা আখ্যা দিয়ে বুঝিয়েছেন বড়ত্ব ও সম্মান মূলত আল্লাহর দাসত্বের পরিচয়ে।

নবী করিম ﷺ প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করে বলেছেন:

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। যেভাবে মারইয়াম-পুত্র ঈসার আ. ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। মূলত আমি তাঁর বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'[১৫২]

---

১৫২. সহীহ বুখারী: ৩৪৪৫।

প্রশংসায় বাড়াবাড়ির পথ বন্ধ করতে তাঁর এই বক্তব্য।

ইন্তিকালের পূর্বে নবীজি বলেছিলেন:

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

'ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।'[১৫৩]

তাদের এই কাজ থেকে তিনি আমাদের সতর্ক করেছেন। শুধু আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেও যেন তার কবরের ওপর কোনো মসজিদ বানানো না হয়। হতে পারে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে একসময় কবরবাসীর ইবাদত শুরু হয়ে যাবে। তাই মাধ্যমকেই বন্ধ করতে তিনি এই কাজ থেকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ইবনু তাইমিয়া ﵀ বলেন: "আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কবরের ওপর মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। কেউ এমন কাজ করলে তার ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। কবর বড় করতে ও একে সম্মান জানাতে নিষেধ করেছেন; বরং একে সমান রাখতে বলেছেন। কবরের দিকে কিংবা আশেপাশে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। কবরের ওপর বাতি জ্বালাতেও নিষেধ করেছেন, যেন একে পরবর্তী সময়ে কেউ প্রতিমারূপে গ্রহণ না করে। কেউ এমন করতে ইচ্ছে করুক বা না করুক কিংবা বিরোধিতা করুক সকলের জন্যে তা সমানভাবে হারাম করেছেন। সাদ্দুয যারায়ে হিসেবে—হারাম কাজের পথ বন্ধ করতে।"[১৫৪]

অর্থাৎ, কারও যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদত করার উদ্দেশ্য থাকে তবুও তার জন্যে এমন কাজ করা হারাম, যা কোনো একসময় কবরপূজায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজর ও আসরের পর নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন, মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যের পথ বন্ধ করতে। কারণ, মুশরিকেরা এই দুই সময়ে সূর্যকে সিজদা করত। ইবনুল কাইয়িম ﵀ এর ভাষায়, অথচ এই সাদৃশ্য কোনো মুসলিমের অন্তরে উদয় হওয়ার কোনো ধরনের সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। তবুও আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদৃশ্যের বিষয়টি পরিপূর্ণ বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন।

---

১৫৩. সহীহ বুখারী: ১৩৯০।

১৫৪. আল ফাতাওয়া আল কুবরা: ১৭৫/৬।

রাসুলের ﷺ যুগে এক ব্যক্তি বাওয়ানা নামক অঞ্চলে উট কোরবানি দেওয়ার মান্নত করেছিল। নবীজি ﷺ বলেছিলেন: সেখানে কি জাহেলী যুগে পূজা করা হতো এমন কোনো মূর্তি আছে? সাহাবারা জবাব দিলেন: না। তিনি আবার বললেন: সেখানে কি জাহেলী কোনো উৎসব পালন করা হতো? তারা আবার জবাব দিলেন: না। শুনে তারপর আল্লাহর রাসূল লোকটিকে মান্নত পূরণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন[১৫৫]। লক্ষ করে দেখুন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আগে ছিল কি না জিজ্ঞেস করছেন, এখন নয়! এত সতর্কতা শুধু শিরকের পথ বন্ধ করতে।

রাসুল ﷺ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর অন্য কারও নামে শপথ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি হাদীসে এসেছে:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

'যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে শপথ করবে সে কুফরী করল। অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে শিরক করল।'[১৫৬]

আল্লাহর সম্মানের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে বরাবর করার পথকে বন্ধ করতেই মূলত তিনি এ কথা বলেছেন।

ঠিক এভাবে সাহাবারা যখন বলল, আল্লাহ ও আপনি যা চান তা-ই হবে। এই কথা শুনে তিনি তাদের এমন কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন।[১৫৭] আবার তিনি সে বক্তাকে তিরস্কার করেছিলেন যে বলেছিল,

مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى

'যে বক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে সঠিক পথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্যচরণ করল, সে পথভ্রষ্ট হলো।'[১৫৮]

তিনি এই বাক্যগুলো থেকে নিষেধ করেছিলেন, যাতে শব্দগত শিরকের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

---

১৫৫. আবু দাউদ: ৩৩১৩।
১৫৬. আবু দাউদ: ৩২৫১।
১৫৭. মাদারিজুস সালেকিন: ৬০২/১।
১৫৮. সহীহ মুসলিম: ৮৭০।

নবীজি ﷺ বলেন:

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ. وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلاَىَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي. وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي

'তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে যে, তোমার প্রভুকে আহার করাও, তোমার প্রভুকে অযু করাও কিংবা তোমার প্রভুকে পান করাও। আর দাস ও বাঁদিরা যেন এই বলে সম্বোধন করে যে, 'আমার মনিব, আমার অভিভাবক'। তোমাদের কেউ যেন এরূপ সম্বোধন না করে যে, 'আমার দাস, আমার দাসী'; বরং সে যেন বলে, আমার বালক, আমার বালিকা, আমার সেবক।'[১৫৯]

অর্থাৎ দাসদাসীরা যেন 'প্রভু' সম্বোধন না করে 'মনিব' সম্বোধন করে। অথচ আরবীতে প্রভু ও মনিব এক অর্থেরই। আবার কেউ 'দাস' বলার পর উদ্দেশ্য থাকে মূলত, সেবক। কোনোরকম শিরকের উদ্দেশ্য ছাড়াই এগুলো আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ইমাম বাগাভী রহ. বলেন: কারণ, মালিকানাধীন ব্যক্তিকে দাস বলে সম্বোধন করলে শিরকের অনুমান হয়।"[১৬০] লক্ষ করুন, শুধু অনুমানের কারণেই আল্লাহর রাসূল এসব থেকে নিষেধ করেছেন।

নবীজি ﷺ আরও নিষেধ করেছেন যেন কোনো ব্যক্তি কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে ঝুঁকে না পড়ে।[১৬১]

এতসব ঘটনা কিসের আলামত? শুধু আকীদাকে হেফাজত করতেই রাসূলের ﷺ এতসব সতর্কতা। এগুলো কৃত্রিমতা নয়, বাড়াবাড়ি নয়। যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে আকীদাগত বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে—যদিও বহুকাল পর—সেসব কর্মকাণ্ডও হারাম। এমনকি যে বলেছে তার আকীদা স্বচ্ছ হলেও।

উলামায়ে কেরাম, যারা মানুষকে পার্লামেন্ট-কেন্দ্রিক নির্বাচন ও ভোটের আহ্বান জানান তারা কি উপরিউক্ত কথাগুলোকে স্বীকার করেন না? আপনারা কি 'সাদ্দুয যারায়ে'কে সমর্থন করেন না? বরং আমরা দেখেছি, আপনারাই মানুষকে এগুলো

---

১৫৯. সহীহ বুখারী: ২৫৫২।

১৬০. শরহুস সুন্নাহ: ৩৯৯/৬। দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ।

১৬১. তিরমিজি: ২৭২৮।

শিখিয়েছেন, বিভিন্নভাবে প্রচার করেছেন। এখন কোথায় গেল তাওহীদের হেফাজত? আকীদাগত বিভ্রান্তির পথ বন্ধ করে দেওয়ার মূলনীতি কি তখন আপনাদের স্মরণে ছিল না যখন জনগণের উদ্দেশ্যে এই প্রেসিডেন্ট বলছিল: আপনাদের দেওয়া বৈধতার ওপর আর কারও বৈধতা নেই!! যখন সে তার প্রথম বক্তব্যে বলেছিল: আপনারা যা ইচ্ছা তা করার অধিকার রাখেন, যাকে ইচ্ছা বাধা দেওয়ারও অধিকার রাখেন!!

'সাদ্দুয যারায়ে' হিসেবে শিরকের পথ বন্ধ করার প্রয়োজন কোনটির বেশি? উদ্দেশ্য ভালো রেখে মনিবকে প্রভু বলা নাকি প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য, নেতৃত্ব শুধু জনগণের এবং সমস্ত ক্ষমতার উৎস তারাই।

'সাদ্দুয যারায়ে' হিসেবে শিরকের পথ বন্ধ করার প্রয়োজন কোনটির বেশি? কবরের ওপর বাতি জ্বালানো নাকি মানবরচিত সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শপথ গ্রহণ করা?

এই কথা কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, শিরকের পথ বন্ধ করতে সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় আল্লাহকে সেজদা দিতে যে শরীয়াহ নিষেধ করেছে সে শরীয়াহ মানবরচিত সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শপথ গ্রহণ করতে অনুমতি দেবে!? বিশেষ করে যে সংবিধানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের জন্যে আইন প্রণয়নের অধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে?!

﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

'তোমাদের কি হলো? তোমাদের এ কেমন বিচার?'[১৬২]

উভয় বাক্য থেকে কোনটি শিরকের অধিক নিকটবর্তী? 'আল্লাহ ও আপনি যা চান তা-ই হবে' বাক্যটি নাকি 'জনগণের নামেই আইন ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হবে' বাক্যটি? বরং শেষোক্ত বাক্যে এটি পর্যন্ত বলা হয়নি যে, জনগণের সাথে সাথে আল্লাহর ইচ্ছারও ধর্তব্য হবে; বরং বলা হয়েছে শুধু জনগণের ইচ্ছাই ধর্তব্য হবে। এতকিছু সত্ত্বেও আপনারা মানুষকে সে সংবিধানের দিকে আহ্বান করছেন। লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

---

১৬২. সূরা সফফাত: ১৫৪।

আপনারা শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যাবে যুক্তি দিয়ে মৃত বাবার ছবি লটকানোকে একবাক্যে হারাম বলে ফেলেন। এমনকি এই বিষয়ে আলেমদের ভিন্নমতের দিকে লক্ষও করেন না। কিন্তু নির্বাচনী পোস্টারে প্রার্থীর ছবির ব্যাপারে আপনাদের এত দৃঢ়তা ও হারাম ফতোয়া কোথায় যায়? অথচ এই প্রার্থীরাই কিছু সময় পর আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে বাদ দিয়ে নিজ থেকে শাসন শুরু করবে।

আপনারা নারীপুরুষের মেলামেশার পথ বন্ধ করার অজুহাতে একসময় ফেসবুক হারাম ফতোয়া দিয়েছিলেন। শাইখ ইয়াসির বোরহামিকে নারী-পুরুষের মধ্যকার ফেসবুক চ্যাটের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন: যেহেতু ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে, তাই সাদ্দুয যারায়ে হিসেবে এই দরজা আমাদের বন্ধ রাখতে হবে।

আর আমিও এই বিষয়ে সতর্কতাকে ভালো চোখে দেখি। কিন্তু এই কথাও বলতে হয়, প্রিয় শাইখেরা, আকীদাগত বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার পথকে বন্ধ করা অধিক জরুরি।

আপনারা কি নেকাব ওয়াজিব বলে অটল থাকেননি? সে সময় আপনারা ফিতনার পথ বন্ধ করার দলিল দিতেন, এমনকি এই বিষয়ে মতানৈক্যকে গ্রহণ করতেন না। আপনারাই বলুন, আকীদাগত বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার পথকে বন্ধ করা কি এখন অধিক প্রয়োজনীয় নয়? এই ব্যাপারে কোনো ধরনের মতানৈক্য কি গ্রহণ করা যায়?

আমাদের নিকট কি এই কথা স্পষ্ট নয় যে, রাসূলের ﷺ যুগে সবচেয়ে ভয়ংকরতম চ্যালেঞ্জ ছিল মূর্তিপূজা ও কবরপূজা, তাই শরীয়াহ তখন এর মাধ্যম ও পথকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন? আর আমাদের এই সময়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরক হলো সবচেয়ে ভয়ংকরতম চ্যালেঞ্জ, তাই এই সময়ে কি উচিত নয় এর পথ ও মাধ্যমকে বন্ধ করে দেওয়া?

আপনারা কি দেখেন না—নবীজির ﷺ যুগে সাহাবাগণ আকীদাগত বিষয়ে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার পরও, এর দিকে যাতে পুনর্বার তারা ফিরে আসতে না পারেন সে লক্ষ্যে তিনি সমস্ত মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছিলেন? অথচ আমাদের এই সময়ে চারিদিকে আকীদাগত বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়ে বিভ্রান্তির পথ বন্ধ করা কি অধিক প্রয়োজনীয় নয়?

সমস্যা হলো, যখন আমরা গণতন্ত্রপন্থীদের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তাগুলোর বিরোধিতা করি তখন কিছু ভাই তাদের পক্ষাবলম্বন করেন। কারণ, হিসেবে তারা দেখান, গণতন্ত্রপন্থীদের অন্য স্থানে দেওয়া বিপরীত বক্তব্যকে! অর্থাৎ, যখন তারা এই বক্তব্য দেন যে, 'আমরা শুধু শরীয়াহর মূলভিত্তিগুলো প্রয়োগ করতে চাই।' তখন আমরা তার বিরোধিতা করি। কিন্তু তখন আমাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়: এত বিরোধিতার কী আছে? এই ব্যক্তি তো অমুক স্থানে বলেছে: 'আমরা শরীয়াহ শাসন চাই!'

সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় সঠিক কথা বললেও যদি কোনো সময় এমন কথা বলতেন, যা আকীদাগতভাবে বিভ্রান্তিকর তখন কি নবীজি ﷺ তাদের বাধা দিতেন না? তারা কি আল্লাহর নামে শপথ করে আবার কখনো বাপদাদার নামেও শপথ করতেন? সাহাবায়ে কেরামের আকীদা এতটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হওয়ার পরও আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ভ্রান্তিমূলক কথা-বার্তাগুলোকে ধরিয়ে দিতেন। অথচ শাসন শুধু আল্লাহর জন্যে করার উদ্দেশ্যে তারা সারা জীবন যুদ্ধ করতেন। পক্ষান্তরে বর্তমান পার্লামেন্টপন্থীরা এমন-সব কথা বলেন, যেখানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে স্পষ্টত শিরক পরিলক্ষিত হয়। তাদের বক্তব্যে তারা স্পষ্টভাবে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে জনগণের আইনের প্রতি সমর্থন জানান। তাদের এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যগুলোকেই তারা বাস্তবায়ন করেন। বিপরীতে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় ভাসতে থাকে, বাস্তবে এটি প্রতিষ্ঠার কোনো নামগন্ধ থাকে না, শুধু মুসলিমদের আবেগে সুড়সুড়ি দিতে কাজে লাগে।

এখন আরেকটি আশ্চর্যজনক বৈপরীত্য লক্ষ করুন। যারা গণতান্ত্রিক পন্থার সমর্থক, তারা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যগুলোর পক্ষে অজুহাত পেশ করেন এভাবে যে, "মানুষ তো সব বোঝে" কিংবা "এই ধরনের বক্তব্য আকীদায় কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না। কারণ, মানুষ জানে এসব বক্তব্য শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলা হয়।"

অথচ এই অজুহাত পেশকারীগণই শরীয়াহকে কিছুকাল প্রয়োগ না করার কথা বলেন। তখন তাদের অজুহাত কী থাকে দেখুন। তারা বলে: যেহেতু মানুষের এখন দীনের সঠিক বুঝ নেই, সমাজের পরতে পরতে যেহেতু ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে, তাই এসব ঠিক করা ছাড়া কীভাবে শরীয়াহ প্রয়োগ করতে বলো!?

আজীব তাদের কাজকারবার!

এদের নিকট একসময় মানুষ সব বোঝে, আকীদাগত বিভ্রান্তি থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারবে। আবার অন্য সময় মানুষ সব মূর্খ, তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে হবে। গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে গিয়ে সময়ে সময়ে আমাদের এই ভাইয়েরা তাদের ভাষা পাল্টায়।

আপনারাই জবাব দিন, বর্তমানে জনসাধারণ কি সাহাবাদের চেয়ে আকীদাগত বিষয়ে অধিক সচেতন? অথচ হারামের পথ বন্ধ রাখতে সাহাবাদের ওপর আল্লাহর রাসূল বিভ্রান্তিকর কথা হারাম করে রেখেছিলেন।

খোলাসা কথা হলো: গণতন্ত্রপন্থীগণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরকের পথ তো বন্ধ করেইনি উপরন্তু তাদের বক্তব্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরক স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি তারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে মানবরচিত আইনে শাসন করাকে সমর্থন করেন। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা তাদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যগুলো বাস্তবায়নও করছেন। তারা শুধু এতটুক বলে ক্ষান্ত হচ্ছেন না যে, জনগণ ও আল্লাহ যা চান তা-ই হবে; বরং তাদের বক্তব্য হলো, জনগণ যা চায় শুধু তা-ই হবে। আরও ভয়ংকর বিষয় হলো, তারা এটিকে শুধু বক্তব্য হিসেবে দেখেন না, সমাজে তা বাস্তবায়নও করে ছাড়েন।

এই পর্বের সারকথা হলো: আলেমগণ হারামের পথ বন্ধ করার নীতিকে গ্রহণ করেন। অথচ শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরকের পথ বন্ধ করা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল।

জনগণের সার্বভৌমত্ব = জনগণের প্রভুত্ব

গত পর্বে আমরা দেখেছি, আকীদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে শরীয়াহ শব্দগত বিভ্রান্তি তৈরি থেকেও আমাদের বাধা দিয়েছে। এমনকি বক্তার উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তার আকীদা যদি স্বচ্ছ হয় তবুও আকীদাগত বিভ্রান্তিমূলক কথা বলা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

এখন আসুন 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' শব্দটিতে। এটির অর্থ ও উদ্দেশ্যে সবই ভ্রান্তিমূলক। আকীদাকে নষ্ট করতে ও বিভ্রান্তি তৈরিতে এটির জুড়ি নেই।

সার্বভৌমত্ব শব্দটির অর্থ কী? সার্বভৌমত্ব হলো: প্রতিটি কাজকর্মকে ভুল কিংবা সঠিক বলে মাপার অধিকার থাকা। কোনো চিন্তাচেতনা কিংবা মূল্যবোধকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলে নির্ণয় করার ক্ষমতা থাকা। এরপর সঠিক করলে প্রতিদান দেওয়া কিংবা ভুল করলে শাস্তি দেওয়া।

কারও সার্বভৌমত্ব থাকার অর্থ হলো, তার কাজকর্মের কারণে তাকে জবাবদিহি করা যাবে না। কারণ, সে নিজেই শাসক। সার্বভৌমত্ব থাকার অর্থ হলো, তার ওপর কারও ক্ষমতা থাকবে না, সকলে তার ইচ্ছার অধীন। সার্বভৌমত্ব তার, সর্বোচ্চ ক্ষমতা যার।

এই অর্থে সার্বভৌমত্বের আরেক অর্থ হলো: প্রভুত্ব, যা শুধু আল্লাহর। এই ক্ষেত্রে তার সাথে কারও অংশীদারত্ব নেই। আমাদের আগের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে আবার লক্ষ করুন, দেখবেন এই অর্থগুলোই এখন জনগণের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে! তথাকথিত ইসলামপন্থীদের মুখ থেকেই এই শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছে!

অতএব, জনগণের সার্বভৌমত্ব হলো নতুন ধর্ম। এই ধর্মে কর্মকে ভুল কিংবা সঠিক বলে মাপার অধিকার শুধু জনগণের। জনগণ যে কাজকে অপরাধ আখ্যা দেবে, সে কাজ যে করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। জনগণের ইচ্ছার সামনে আল্লাহর ইচ্ছার কোনো মূল্য থাকবে না। এই ধর্মে সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব হলো জনগণের।

এখন আসুন, আল্লাহর ধর্মে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র ধর্মে জনগণের সার্বভৌমত্বের মাঝে কিছু তুলনা করি।

'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' বাক্যটি নতুন কিছু নয়। হাদীসে এসেছে: বনু আমেরের প্রতিনিধিদল আল্লাহর রাসূলকে বললেন: আপনি আমাদের নেতা (সার্বভৌম শক্তির অধিকারী)। তিনি জবাব দিলেন: নেতা হলেন একমাত্র আল্লাহ। অর্থাৎ, নিঃশর্ত নেতৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব হলো একমাত্র আল্লাহর।[১৬৩]

---

১৬৩. আবু দাউদ: ৪৮০৬।

আল্লাহ নিজের সার্বভৌমত্ব কীভাবে জাহির করছে দেখুন। বলেছেন:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

'শাসন একমাত্র আল্লাহর।'

অর্থাৎ, যত ধরনের হুকুম হতে পারে তা শুধু আল্লাহর। আর কারও নয়। কোনো কাজ বা কথাকে ভুল কিংবা সঠিক বলার অধিকার শুধু আল্লাহর। এ ক্ষেত্রে তার সাথে কারও অংশীদারত্ব চলবে না। মানুষকে কোনো কাজে বাধ্য করা কিংবা নিষেধ করার অধিকার শুধু আল্লাহর। এ ক্ষেত্রেও তাঁর সাথে কারও অংশীদারত্ব চলবে না। কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার পর সেটি ঠিক হলে প্রতিদান দেওয়া ও ভুল হলে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও মহান আল্লাহর। এতসব অর্থ সবগুলোই উপরিউক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। শাসন একমাত্র আল্লাহরই।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এরপরে কী বলেছেন? হযরত ইউসুফের ভাষায় কুরআনে এসেছে:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

'বিধান দেবার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না।'[১৬৪]

অতএব শাসনক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট অর্পণ করা তাদের ইবাদত করার নামান্তর। অন্য কাউকে ভুল সঠিক নির্ধারণের অধিকার দেওয়া তার ইবাদত করার নামান্তর। বিরোধিতা করলে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও নিকট অর্পণ করলে সেটি তার ইবাদত করার শামিল।

﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

'তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না।'

এখন একে তুলনা করুন গণতন্ত্র ধর্মের মূলনীতির সাথে। এর শয়তানী সংবিধানের তৃতীয় ধারায় উল্লেখ আছে: সার্বভৌমত্ব শুধু জনগণের!

---

১৬৪. সূরা ইউসুফ: ৪০।

এই আয়াতকে আরও তুলনা করুন তথাকথিত ইসলামপন্থী দলগুলোর দেওয়া বক্তৃতার সাথে। এখানে আমরা কোনো ব্যক্তি বা দলের নাম নেব না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু, যে কারও বক্তব্য হোক-না কেন, জনগণকে এই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া, যাতে করে তারা এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। 'শাসন শুধু আল্লাহর' এখন আসুন এই আয়াতের সাথে তাদের একজনের বক্তব্য তুলনা করি। সে বলেছে: "আমরা গণতন্ত্রের সমস্ত মূলনীতির সাথে একমত। বিভিন্ন দলের উপস্থিতিকে আমরা মেনে নেব। ব্যক্তি বা মূল্যবোধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা শুধু জনগণের।"

আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্বের কথা কীভাবে জানান দিচ্ছে দেখুন:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾

'শাসন শুধু আল্লাহর। তিনি হককে বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।'[১৬৫]

অতএব সমস্ত বিষয়ে মীমাংসা করার অধিকার শুধু আল্লাহর। এটিই হলো আল্লাহকে রব ও ইসলামকে দীন হিসেবে মেনে নেওয়ার অন্যতম শর্ত।

এখন এই আয়াতটি তুলনা করুন গণতন্ত্র ধর্মের এক কর্তাব্যক্তির বক্তব্যের সাথে। সে বলেছে: "জনগণের মীমাংসাকেই আমরা মেনে নেব। জনগণ যা চান তা ফয়সালা করবেন, যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবেন। রাষ্ট্রনীতি ও গণতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে তারাই এই অধিকার রাখেন।"

আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্ব কীভাবে স্পষ্ট করছে দেখুন:

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾

'আর আল্লাহই একমাত্র আদেশ করেন। তাঁর আদেশ রদ করার ক্ষমতা কারও নেই।'[১৬৬]

অপরদিকে গণতন্ত্র ধর্মের এক ধার্মিকের বয়ান শুনুন। সে বলেছে: জনগণের ইচ্ছাকে আমরা সব সময় মেনে নেব। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে যে ফলাফলই আসুক না কেন

---

১৬৫. সূরা আনআম: ৫৭।
১৬৬. সূরা র'দ: ৪১।

তা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। কেননা, ভোট ও গণতন্ত্রই হলো একমাত্র সঠিক ও নিরাপদ পদ্ধতি।

অর্থাৎ, তাদের চোখে গণতন্ত্র শরীয়াহ প্রয়োগ করার একটি মাধ্যম শুধু নয়; বরং এটিই একমাত্র সঠিক ও নিরাপদ পন্থা! জনগণের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধের দাঁড়াবার শক্তি কার!!

অতএব যারা আল্লাহকে রব ও ইসলামকে দীন হিসেবে মেনে নিয়েছেন! আপনারাই বলুন, তাদের বক্তব্য কি এই অর্থ বহন করে না যে, গণতন্ত্রই তাদের জীবনপদ্ধতি? জনগণের শাসন তাদের একমাত্র চাওয়া? বলতে গেলে এটিই তাদের ধর্ম?

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

'তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?'[১৬৭]

এখন তাদের এই সমস্ত বক্তব্যের সমর্থনে অনেকেই এই অজুহাত পেশ করবেন যে, 'যেহেতু জনগণ অধিকাংশ মুসলিম, তাই তারা শরীয়াহকেই গ্রহণ করে নেবে। অতএব জনগণের সার্বভৌমত্ব মূলত শরীয়াহ প্রয়োগকেই নিশ্চিত করবে।' অর্থাৎ, জনগণের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই কথাটা অনেকটা জনগণের দাসত্ব করার মাধ্যমে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার করার মতো! এই কথাটি আমাদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

'আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।'[১৬৮]

ঠিক একইভাবে তাদের বক্তব্য হলো: আমরা জনগণের নিকট শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করি, যাতে এরা আমাদের আল্লাহর নিকট শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করার নিকটবর্তী করে দেয়! 'তারেক ও সালমার গল্প' পর্বে আমরা এই কথাগুলোর ভরপুর জবাব দিয়েছিলাম।

---

১৬৭. সূরা আনআম: ১১৪।

১৬৮. সূরা যুমার: ৩।

হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তা বলে যারা চারিদিকে পালাবার পথ খোলা রাখেন, সে সমস্ত ব্যক্তিরা এখন খুব বেশি চালাক সেজে প্রশ্ন করবেন: তাহলে কি আপনি বলতে চান যে, শাসক নির্বাচন কিংবা অপসারণ করার ক্ষেত্রে জনগণের কোনো ক্ষমতা নেই?

আমাদের জবাব হলো: আমরা দুটির মাঝে পার্থক্য করতে জানি। একটি হলো সার্বভৌমত্ব, যেখানে মানুষের কোনো অধিকার নেই। আরেকটি হলো ক্ষমতা, এর মাধ্যমে জনগণ এমন একজন মুসলিম শাসক নির্বাচন করবেন, যে শরীয়াহ দ্বারা শাসন করবে। যদি শাসক যুলুম করে কিংবা শরীয়াহ-শাসনে গড়িমসি করে তাহলে জনগণের ক্ষমতা থাকবে একে অপসারণ করার। জনগণের এই ক্ষমতাকে আমরা স্বীকার করি; বরং আমরা এটিকে তাদের অধিকার মনে করি।

শাসক নির্বাচন কিংবা অপসারণের ক্ষেত্রে জনগণের এই ক্ষমতার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধিবিধান রয়েছে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে, 'শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব' হলো জনগণ ও শাসক উভয় পক্ষের মাঝে সংঘটিত চুক্তির মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় ধারা। এখানে জনগণ শাসককে অপসারণ করবে, যদি সে এই সার্বভৌমত্বকে কোনোভাবে খর্ব করে। অপরদিকে শাসক গণতন্ত্রের ন্যায় এখানে জনগণের ইচ্ছার দাসে পরিণত হবে না; বরং সে জনগণ থেকে শরীয়াহ প্রয়োগের শর্তেই বায়আত গ্রহণ করবে। যদি জনগণের কেউ এই বায়আতের কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটায় তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

আবার স্পষ্ট করে বলি, শরীয়াহবিদ্বেষী স্বৈরশাসককে উৎখাত করতে সাময়িকভাবে জনগণের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়ারই আমরা মূলত বিরোধিতা করছি। আমরা তখনো তার বিরোধিতা করব যে বলবে: জনগণের সার্বভৌমত্বকে আমরা আসলে সমর্থন করি না। এটিকে মূলত সাময়িক পন্থা হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি।

কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্রপন্থীরা অনেক দূর পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। তাদের বক্তব্যগুলোতে তারা জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এটিকে সাময়িক একটি পন্থা হিসেবে শুধু গ্রহণ করেননি; বরং এটি তাদের মন মস্তিষ্কে খুব দৃঢ়ভাবে গেঁথে রয়েছে। এমনকি জনগণের ইচ্ছা তাদের নিকট এতটা পবিত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, যদি তা ইসলামবিরোধীও হয় তবুও তারা তা বাস্তবায়ন করবেন!

এখন মানুষের অন্তরে এই কথা গেঁথে গেছে যে, জনগণই হলো সব বিষয়ে শাসন করার একমাত্র হকদার। তার ইচ্ছা যা-ই হোক-না কেন, তা সম্মানযোগ্য। বৈধতা দেওয়ারও একমাত্র মালিক তারা। এই ধরনের বাতিল ও নষ্ট ধারণা আর গণতন্ত্র নামক এই নতুন ধর্ম মানুষের আকীদা ও চিন্তাকে নষ্ট করেছে, তাদের চিন্তায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এই পর্বের সারকথা হলো, জনগণের সার্বভৌমত্বের আরেক অর্থ হলো, জনগণের প্রভুত্ব। সার্বভৌমত্ব বলা হয়: কথা, কাজ, মূল্যবোধ ও চিন্তাকে সত্য বা মিথ্যা বলার অধিকার থাকা ও সে অনুযায়ী শাস্তি বা প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা থাকা। অথচ এসব কিছুর সবগুলোই একমাত্র আল্লাহর অধিকার, যা এখন মানুষের জন্যে সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

হযরত আবু বকর ﵁ জনসমর্থিত বৈধ শাসক ছিলেন না!

গত পর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, জনগণের সার্বভৌমত্বের আরেক অর্থ হলো, জনগণের প্রভুত্ব। এখন আমরা আলোচনা করব, মুসলিমের আকীদায় পড়া এই সার্বভৌমত্বের ছয়টি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে। যাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, গণতন্ত্রকে আমরা নতুন ধর্ম আখ্যা দিয়ে আসলে বাড়াবাড়ি কিছু করিনি।

সার্বভৌমত্বের প্রথম প্রভাব হলো: 'জনবৈধতা'কে স্বীকৃতি প্রদান। জনবৈধতার অর্থ হলো, কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা বা শাসককে শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচনের ভিত্তিতে বৈধতা প্রদান করা, সে কিসের মাধ্যমে শাসন করবে এর দিকে লক্ষ করা হবে না। 'সে কিসের মাধ্যমে শাসন করবে এর দিকে লক্ষ করা হবে না' বাক্যটি এ জন্যে বললাম, যাতে কেউ এই ধারণা করে না বসে যে, আমরা জনগণের ক্ষমতাকেই অস্বীকার করছি। গত পর্বে আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, মুসলিম জনগণের এমন শাসক নির্বাচন করার অধিকার আছে, যে তাদের শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করবেন। আমরা মূলত এখানে কথা বলছি তাদের ব্যাপারে, যারা মনে করেন, শরীয়াহকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া শুধু জনগণের নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ শাসক হওয়া যায়। কিন্তু শাসন শরীয়াহভিত্তিক না হলেও, শাসকের প্রতি আনুগত্যের জন্যে তারা ঠিকই ইসলামী শরীয়াহর উদ্ধৃতিগুলোকে ব্যবহার করেন।

আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলি: আপনাদের অবস্থান স্পষ্ট ও পরিষ্কার করুন। আপনাদের উৎস কি আল্লাহর কিতাবের সে আয়াত যেখানে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের।'[১৬৯]

তাহলে শুনুন, সে আল্লাহর কিতাবে আরও বলা হয়েছে:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'আমি আপনাকে রেখেছি দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়াহর ওপর। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।'[১৭০]

যদি আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করে থাকেন তাহলে সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণভাবে একেই মেনে নিন। আর নাহয় শুনুন আল্লাহ কী বলেছেন:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾

'তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে যখন তাদের আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর হক যদি তাদের স্বপক্ষে হয়, তখন তারা বিনীত হয়ে ছুটে আসে।'[১৭১]

নাকি কী দ্বারা শাসন করা হচ্ছে তার দিকে লক্ষ করা ছাড়া, আপনাদের নিকট এই শাসকের বৈধতার উৎস শুধু জনগণ? যদি এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে, যে ব্যক্তি শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করে না তার আনুগত্যের জন্যে শরীয়াহর বক্তব্য উপস্থাপন করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই।

---

১৬৯. সূরা নিসা: ৫৯।

১৭০. সূরা জাসিয়া: ১৮।

১৭১. সূরা নুর: ৪৮-৪৯।

অতএব শরীয়াহ হলো, শাসক ও জনগণ উভয়ের মধ্যকার চুক্তিতে একটি অত্যাবশ্যকীয় ধারা। শরীয়াহ থাকতেই হবে। এক আযহারী মুফতি একটি ফতোয়া জারি করেছেন। ফতোয়াটিতে তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের সার্বভৌমত্বের মাঝে একাকার করে ফেলেছেন। তিনি লিখেছেন, এই শাসকের ওপর বিদ্রোহ করা হারাম। কারণ, জনগণ স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে তাকে প্রত্যক্ষভাবে বায়আত দিয়েছেন। এই হিসেবে বর্তমানে একমাত্র 'বৈধ' শাসক হলো অমুক। যারা তার ওপর বিদ্রোহ করবে তারা চরম ফিতনাবাজ বলে বিবেচিত হবে। এমনকি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে সে আন্দোলন খারেজীদের আন্দোলন বলে গণ্য হবে। কারণ, এর মাধ্যমে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে! তারপর এই আযহারী, বিদ্রোহীদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে সে বিষয়ে শরীয়ত থেকে দলিল দিয়েছেন। এমনকি তাদের ওপর ফেতনার শাস্তি প্রয়োগের কথা বলেছেন। বৈপরীত্য ও বিভ্রান্তিতে ভরপুর একটি ফতোয়া। উৎস হিসেবে আল্লাহকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেভাবে বান্দাকেও গ্রহণ করেছেন!

বৈধতা হয়তো শরীয়াহ থেকে গ্রহণ করা হবে নাহয় জনগণ থেকে। যদি শরীয়াহ থেকে গ্রহণ করা হয় তাহলে শাসকের ওপর তখন শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করা আবশ্যক, বিনিময়ে জনগণের ওপর এই শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু শুধু জনগণ থেকেই যদি আপনারা বৈধতা গ্রহণ করেন, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্যকে সামনে টেনে আনার কী প্রয়োজন? বরং দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট করে বলুন: গণতন্ত্র ধর্মে এমন বলা হয়েছে, এই ধর্মের নবী রুশো এমন বলেছেন।

জনগণের নির্বাচনকেই যদি শাসকের বৈধতার একমাত্র মাপকাঠি ধরা হয়, তাহলে তারা যদি সেক্যুলার শাসক নির্ধারণ করেন সেও বৈধ শাসক বলে গণ্য হবে! পূর্বের ফতোয়া অনুযায়ী তখন এই সেক্যুলার শাসকের বিরোধিতা করা হলে তার ওপরও ফেতনার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে! কারণ, তারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করছে। এই ধরনের ফতোয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে।

দ্বিতীয় প্রভাব: 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' পরিভাষাটি প্রচলিত হওয়ার পর সবচেয়ে ভয়ংকর যে প্রভাবটি পড়েছে তা হলো, জনমনে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, তথাকথিত বৈধ ও স্বীকৃত শাসকের বিরোধিতা করা যাবে না, যদিও এই বিরোধিতা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বৈধ হয়!

এমনকি আমরা দেখতে পাই যে, মিসরীয় সীমান্তে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কিত গ্যাসলাইনে বিস্ফোরণ ঘটানো কিংবা ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করার বিষয়টিকে অনেকেই বিরোধিতা করেন। কারণ, হিসেবে তারা দেখান যে, এটি বর্তমান বৈধ সরকারের নীতিবিরোধী কাজ!

আপনারাই বলুন, বর্তমান শাসকের ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে বিরত থাকার আদেশটি কি শরীয়াহর বক্তব্যের সাথে যায়? যদি শরীয়াহর কোনো বক্তব্যও সে কথা বলে, তাহলে সে বক্তব্যটি আমাদের নিকট স্পষ্ট করুন। নাকি শরীয়াহর দলিল-প্রমাণের কোনো গ্রহণযোগ্যতা আপনাদের নিকট নেই? ও আচ্ছা! আপনারা তো মনে করেন, জনগণ যাকে বৈধতা দিয়েছে সমস্ত অধিকার তার। এমনকি সে ব্যক্তিকেও শাস্তি দেওয়ার অধিকার তার আছে, যার কর্মকাণ্ড খোদ আল্লাহর নিকট বৈধ!

আপনি যদি তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করেন: তুমি ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিরোধিতা করছ কারণ নির্বাচিত বৈধ প্রেসিডেন্ট এ থেকে বারণ করেছেন। তার মানে কি এটি বোঝাতে চাচ্ছ যে, এই অবস্থায় জিহাদ করা শরীয়াহসম্মত নয়, হারাম? তখন সে হয়তো 'হ্যাঁ' বলতে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়বে। কিন্তু যদি হারাম না বলে এটি বলেন যে: তুমি কি বলতে চাচ্ছ তাদের এই জিহাদ ভুল? সে কোনোরকম ইতস্তত না করে তাড়াতাড়ি জবাব দেবে: হ্যাঁ ভুল। তারপর সে 'কেন ভুল', তার অনেক কারণ বর্ণনা করতে শুরু করবে। বোঝা গেল, তাদের নিকট শরীয়াহ ছাড়াও ভুল-ঠিক নির্ধারণের আরও অনেক মাপকাঠি আছে।

তৃতীয় প্রভাব: 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' পরিভাষাটির আরেকটি প্রভাব হলো, ইসলামের আবরণে সেক্যুলারিজমের প্রচলন ঘটা। সেক্যুলারিজম কী? সেক্যুলারিজম হলো, আপনার ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদত করুন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে অধিকাংশ জনগণ যেদিকে যাবে তা মেনে নিতে হবে। তখন ইসলামী শাসক কিংবা আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলা যাবে না। সেক্যুলারিজমের চ্যালা-চামুণ্ডারা বহু বছর চেষ্টা করেও এই মূলনীতির প্রচলত ঘটাতে পারেনি। মানুষজন তাদের কণ্ঠস্বর শুনেই তাদের চিনতে পারত, আর তাদের আহ্বানকে একবাক্যে বর্জন করত। কিন্তু এগুলোকে যখন ইসলামের মোড়কে উপস্থাপন করা হলো, ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষার সাথে যখন এগুলোকে গুলিয়ে সামনে আনা হলো, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্বকে যখন একাকার করে ফেলা

হলো তখন মুসলিমদের ঘরে ঘরে সেক্যুলারদের এই মূলনীতিগুলো সহজেই প্রবেশ করতে সক্ষম হলো।

চতুর্থ প্রভাব: 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' বাক্যটির মাধ্যমে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'[১৭২] এর আকীদা মুছে ফেলা হয়েছে। নাগরিকত্বের ভিত্তিতে মুসলিম ও কাফেরের মাঝে সমতা তৈরি করা হয়েছে। এমনকি শরীয়াহ যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি করেছে সেসব ক্ষেত্রেও সমতা তৈরি হয়েছে। খোদাভীরু আলিম, মুসলিম, খ্রিষ্টান, কমিউনিস্ট, নাস্তিক, সমকামী সকলেই রাষ্ট্রের নিকট সমান। সকলেই এই জাতির অংশ। প্রত্যেকের জন্যেই নির্ধারিতভাবে বণ্টনকৃত সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ, প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাদের সকলের সমান অধিকার রয়েছে। তাই কোনো কাফেরকে কাফের, ফাসেক, ভ্রষ্ট বলা যাবে না। কেননা, সেও ছোটখাটো প্রভু। কোনো একসময় তাদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা জনবৈধতা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন এই কাফেরের কুফরীও রাষ্ট্রের নিকট আইনে পরিণত হবে। একে মানলে প্রতিদান দেওয়া হবে, না মানলে শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু এখানে প্রত্যেকেই আনুপাতিক হারে প্রভু তাই কাউকে পরিপূর্ণ সঠিক কিংবা পরিপূর্ণ ভ্রান্ত বলা যাবে না।

পঞ্চম প্রভাব: এই সার্বভৌমত্বের আরেকটি প্রভাব হলো, আপনি এমন অনেক মানুষ দেখতে পাবেন, যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও, পশ্চিমের প্রণীত আইনকে সমর্থন করেন। যেমন, একজন ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব নিষিদ্ধ করেছিলেন এই বিবেচনায় যে, এই আইনটি অধিকাংশের ভোটে প্রণীত হয়েছে আর এই হিসেবে এটি বৈধতাও অর্জন করেছে! এহেন কাজ করার পরও তিনি নিজেকে মুসলিম দাবি করেন। একটি আইন অনৈসলামী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অধিকাংশের দোহাই দিয়ে তা বাস্তবায়ন করলেন।

কারণ, সার্বভৌমত্ব হয়তো ইসলামের হবে নাহয় জনগণের। যদি ইসলামের হয় তাহলে আইন শরীয়াহর গণ্ডির ভেতর থাকতে হবে। আর যদি সার্বভৌমত্ব জনগণের হয় তাহলে, অধিকাংশ যা বলে তা-ই হবে। তখন সমস্ত জিনিসের বৈধতা তারাই নির্ধারণ করবে।

---

১৭২. ১৩৯ নং টীকা দেখুন।

ষষ্ঠ প্রভাব: জনগণের সার্বভৌমত্বের আরেকটি প্রভাব হলো, জিহাদুত তলব বা আক্রমণাত্মক জিহাদের মতো শরীয়াহর বিভিন্ন বিধান বাতিল হয়ে যাওয়া। আমি বুঝতে পারছি না, এই সার্বভৌমত্বকে আঁকড়ে ধরে ইসলামী বিজয় বা জিহাদুত তলব কীভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব? কারণ, এতে জিযয়া অস্বীকারকারী বা ইসলামবিরোধী জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্বের প্রতিও মূল্য দেওয়া হয়। দুটি বিষয়ের মাঝে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব? একদিকে আল্লাহ্ বলছেন:

﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

'আল্লাহর সমস্ত হুকুম যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'[১৭৩]

অপরদিকে জনগণের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা।

দেখুন, নবী করিম ﷺ এর মৃত্যুর পর যখন আরবের অনেক গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল, অনেকেই যখন যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকল তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, জনবৈধতা হযরত আবু বকরের رضي الله عنه হাতে নেই। সে সময় যদি 'স্বচ্ছ' গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতো তাহলে শুধু হানিফা গোত্রের একলাখ মানুষের সমর্থনেই মুসায়লামাতুল কাযযাব বিজয়ী হয়ে যেত। এই হিসেবে—গণতন্ত্র ধর্মমতে—যাকাত অস্বীকারকারী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকরের এই যুদ্ধ ছিল মূলত জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা, ধর্মীয় স্বৈরশাসন, ও ব্যক্তিগত ইসলামী মতাদর্শ অপরের ওপর চাপানোর ঘৃণ্য প্রচেষ্টা!—গণতন্ত্র ধর্মমতে—অথচ তার উচিত ছিল নিজস্ব ইসলামী ধারণাকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করা, আর যেকোনো বিষয়ে ভোটাভুটি করা! ফলাফল যা-ই হোক-না কেন মেনে নেওয়া!!

অথচ আল্লাহর ধর্মমতে, শরীয়াহ প্রয়োগ হলো শাসক ও জনগণ উভয় পক্ষের মাঝে কৃত চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় ধারা। যদি শাসক শরীয়াহভিত্তিক শাসন থেকে বের হয়ে যায় তাহলে জনগণ তাকে অপসারণ করবে। আর জনগণের কিছু অংশ যদি শরীয়াহ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে শাসক তাদের ফিরিয়ে আনতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

---

১৭৩. সূরা আনফাল: ৩৯।

পরিশেষে একটি কথা বলে রাখা জরুরি মনে করছি, মূলত আমাদের প্রকৃত সমস্যা মুসলিম জনগণের সাথে নয়। আমাদের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে কেউ যেন এই ভেবে না বসে যে, জনগণ সার্বভৌমত্বের দাবি করছে আর আমরা তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছি; বরং আমাদের মূল সমস্যা হলো সে সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে, যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে। এমনকি তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এমন-সব অদ্ভুত চেতনা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা মুসলিম জনগণকে ইসলামের অকাট্য বিষয়েও বিভ্রান্ত করে ছাড়ছে।

না শরীয়াহ্ কায়েম করেছ, না জনগণের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেছ

প্রিয় ভাইয়েরা, গত পর্বে আমরা 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' পরিভাষাটির কিছু ভয়ংকর প্রভাব বর্ণনা করেছি। এখন আমরা স্পষ্ট করব যে, যারা ইসলামের নাম ভাঙিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় অংশগ্রহণ করেছেন দিনশেষে তারা না শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছেন না জনগণের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেছেন; বরং তারা এমন-সব কাজ করেছেন, যা আল্লাহকে তো অসন্তুষ্ট করবেই, সাথে সাথে জনগণের ইচ্ছার প্রতিও অশ্রদ্ধা হবে। তাদের এই কাজ একমাত্র শরীয়াহর শত্রুদেরই সন্তুষ্ট করবে। গণতন্ত্রের ইসলামীকরণের কথা যারা বলেছিলেন তারা ক্ষমতায় আরোহণের পর এখন পর্যন্ত চার মাস অতিবাহিত হতে চলল। এখন আসুন, এই চার মাসে যে সমস্ত নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলোকে আমরা একটু পর্যালোচনা করি।

এই নীতিগুলো পর্যালোচনার সময় আমরা যেন নিজেদেরই প্রশ্ন করি, এই কাজগুলো কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে? সন্তুষ্টি বাদ দিন অন্ততপক্ষে জনগণের ইচ্ছার কি মূল্যায়ন করা হয়েছে? তখন আমরা বুঝতে সক্ষম হব, তারা যে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলেন সে ব্যাপারে তারা নিজেরাই শতভাগ বিশ্বাসী নয়। আসুন নীতিগুলো পর্যালোচনা করি।

এক: সিনাই অপারেশন। এই অপারেশন তারা সৈনিক হত্যার অজুহাতে পরিচালনা করলেও এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এই অপারেশনের সাথে হত্যাকাণ্ডের কোনো ধরনের সম্পর্কই নেই; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সিনাইয়ের মুজাহিদদের

হত্যা করে সীমান্তকে শান্ত রাখা। সিনাই হলো মিসরের সাথে ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী এলাকা, মিসরের গ্যাস এই অঞ্চল দিয়েই ইসরায়েলে প্রবেশ করে। তাই আমেরিকা ও যায়নবাদীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তারা নিজেদের অনুকূলে রাখতেই মূলত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এই অপারেশন পরিচালনা করেছে। আর এর মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাস দমন ও সীমান্ত রক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখানোতে পশ্চিমের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসাও পেয়েছেন![১৭৪]

দুই: নিজের আকাশে ইসরায়েলের ড্রোন বিমান দেখার পরও তা এড়িয়ে যাওয়া। ড্রোনটি সরাসরি আক্রমণ করেছিল সীনাই অঞ্চলে অবস্থানরত মুজাহিদদের ঘাঁটিতে।[১৭৫]

তিন: মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি বা ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে কোনোরকম পরিবর্তন হবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া। এই ঘোষণা কি অধিকাংশ মিসরবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়? ইহুদিদের প্রতি মিসরবাসীর তীব্র ক্রোধের কথা সকলেরই জানা। ফিলিস্তিনের মুসলিমদের সাহায্যে তারাই সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চার: মুদ্রা তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ। অধিকাংশ জনগণ এর বিপক্ষে ছিল। এই কাজ করার আগে কি জনগণ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল?

পাঁচ: সরকারি প্রতিষ্ঠানে একজন খ্রিষ্টানকে নিযুক্ত করা হলো এমন সময়ে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার কিবতি গির্জা আমাদের বোনদের বন্দী করে তাদের ওপর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল। ক্রিষ্টিন ইজ্জত ও ন্যান্সি মাজদির মতো অনেকেই যারা খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করল তাদের অপহরণ করা হলো।[১৭৬] যে সরকার সিনাইয়ের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছিল তাদের গির্জার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দ করতে দেখা যায়নি, অপহরণকৃত বোনদের ব্যাপারে সামান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম, এই কাজগুলো তাদের ইচ্ছার প্রতি অবমূল্যায়ন নয় কি?

---

১৭৪. সিনাঈ অপারেশন হলো ২০১২ এর অগাস্ট মাসে সিনাইয়ে অবস্থানকারী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযান। এই অভিযানে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার বিষয়টি পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে এসেছিল। দেখুন আল মিসরিয়ুল য়াউম পত্রিকা: https://www.almasryalyoum.com/news/details/২৩৫৩৯৪.

১৭৫. দেখুন আশ শুরুক পত্রিকা: http://bit.ly/SVTlG১.

১৭৬. ৮১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

ছয়: পাঠ্য সিলেবাসে ইঞ্জিলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে। এমন-সব বক্তব্য স্থান দেওয়া হয়েছে, যা সরাসরি হাদীস ও ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক। সেখানে বলা আছে, কেউ তার ধর্ম পরিবর্তন করলেও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। যদি কোনোভাবে ভোট নেওয়া হয়, তাহলে অধিকাংশ জনগণ কি এই সিলেবাসকে মেনে নেবে?

সাত: ইরান সফর ও সেখানকার প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোলাকুলি করে যেন এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইরানের যুদ্ধাপরাধ থেকে তাদের নির্দোষ ঘোষণা করা হলো। এভাবে তাদের অপরাধের ওপর বালি ছিটিয়ে বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হলো। জনগণ কি এই দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল?[১৭৭]

আট: অশ্লীল ও ফাসিক অভিনয়-শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করা। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও চরিত্রকে সাপোর্ট করা হবে।[১৭৮]

নয়: জাতিসংঘে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, মিসর সুদানের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে। এই বাহিনী সেখানকার মুজাহিদদের ওপর দমন-নিপীড়নের কারণে বেশ আলোচিত। এটিও কি মিসরবাসীর পরামর্শে করা হয়েছে?[১৭৯]

দশ: ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট শিমন প্যারেজের প্রতি ভালোবাসায় গদগদস্বরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠির প্রথম বাক্য হলো, "ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট মহামান্য শিমন প্যারেজ, আমার প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু!" সেখানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্প্রীতি, ভালোবাসা বৃদ্ধি, ও পররাষ্ট্রনীতির উন্নয়নের প্রতি আগ্রহ দেখানো হয়েছে। চিঠি শেষ হয়েছে 'আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু' বাক্য ব্যবহার করে।[১৮০] এই চিঠি কি জনগণের পরামর্শে ছিল? যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে কেন প্রথমে এই চিঠিকে অস্বীকার করার দুই মাস পর আবার স্বীকার করা হলো? নবী করিম কি বলেননি:

---

১৭৭. তৎকালীন ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাতের সাথে মুরসির সাক্ষাৎ সম্পর্কে আল আলাম পত্রিকার রিপোর্ট: http://bit.ly/TTQ৫Gj

১৭৮. অভিনয় শিল্পীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া মুরসির বক্তব্য: https://youtu.be/WFx৩Usx৬RAc

১৭৯. আনাদোল এজেন্সির রিপোর্ট: https://bit.ly/২DoixcU.

১৮০. দেখুন আল মাসরাভী পত্রিকা: https://bit.ly/৩ozK৮cN.

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। আর তাদের জন্য থাকবে কষ্টদায়ক শাস্তি। ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী গরিব।'[১৮১]

এ ছাড়া, আমেরিকার সাথে যৌথভাবে সেনাপ্রশিক্ষণ করা হলো এমন সময়ে যখন হলিউড রাসূলের প্রতি কটাক্ষ করে সিনেমা বানাল। তবুও আমেরিকার গুপ্তচর এই মিশরী রাষ্ট্রদূতের সম্মানকে বড় করে দেখানো হলো।

আমরা এতক্ষণে সরকারের সেসব বিষয় শুধু আলোচনা করেছি, যা ছিল সরাসরি আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা। এই সরকারের প্রতি আমাদের যে প্রত্যাশাগুলো ছিল, অথচ যা পূরণ হয়নি আমরা সেসব বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলিনি।

এখন আমার ভাইয়েরা আসুন, দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট একটু লক্ষ করি।

প্রথম পয়েন্ট: 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কথা বাদ দিলেও এই কথা স্পষ্ট যে, এটি এমন একটি মতবাদ, যা গণমাধ্যমের একচোখা নীতির কারণে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, গণমাধ্যম জনগণের মত, তাদের ঝোঁক ও গতিপ্রকৃতি নিজের মতো করে তৈরি করে। তারপর এভাবে তা উপস্থাপন করবে, যা সম্পূর্ণ বাস্তবতা-বিবর্জিত ও বিভ্রান্তিকর। যাতে করে শেষমেশ জনগণের ইচ্ছা নয়; বরং তাদের শত্রুদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা পায়। জাতির শত্রুরাই গণমাধ্যমের লাগাম ধরে আছে। উদাহরণস্বরূপ, সিনাইয়ের অপারেশনে গণমাধ্যমের মিথ্যাচার দেখুন। বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে তারা বিষয়টি পরিবেশন করেছিল। যদি সঠিকভাবে তা উপস্থাপিত হতো তাহলে জনগণ এই অপারেশনের কঠোর বিরোধিতা করত।

দ্বিতীয় পয়েন্ট: গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণের কথা যারা বলতেন তারা 'জনগণের সার্বভৌমত্ব'কে এই কথা বলে বৈধতা দিতেন যে, এর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত শরীয়াহই

---

১৮১. সহীহ মুসলিম: ১০৭।

প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু ক্ষমতায় পৌঁছে তারা এমন পাঠ্য-সিলেবাস তৈরি করলেন, যা জনগণের ইচ্ছাকেই পাল্টে দিয়ে শরীয়াহর শত্রুদের অনুগামী করে দেবে। কারণ, পরবর্তী প্রজন্মের নিকট এই সিলেবাসের একটি ভয়ংকর প্রভাব পড়তে যাচ্ছে।

আচ্ছা, আপনারা যারা গণতন্ত্রের ইসলামীকরণের কথা বলেন! এতসব ভয়ংকর কর্মকাণ্ডের পর আপনারাই কি মনে করেন এর মাধ্যমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব? যারা বলেন—এই নতুন প্রেসিডেন্টকে একটু সুযোগ দাও, এক দুই মাসে তো আর সব পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়, আপনারাই বলুন আপনাদের প্রেসিডেন্ট কি এমন কোনো একটি কাজ করেছে, যার কারণে আমরা বলতে পারব, লোকটাকে সময় দেওয়া উচিত? অথচ বাস্তবতা হলো, সে এই এক দুই মাসে এমন-সব কাজ করেছে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ও শত্রুদের সন্তুষ্ট করতে যথেষ্ট।

আপনারা যারা এর সমর্থক! কীভাবে এতটা অবুঝ আচরণ করতে পারেন? আপনাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠা কোথায় গেল? পর্যায়ক্রমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এখন কোথায়? দীন কায়েম করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার যে কথাগুলো বলতেন তা আজ কোথায়? বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি, একে একে ইসলামের মূল স্তম্ভগুলো ধসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন তো দেখতে পাচ্ছি, জনগণের যে সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছিল সেটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

পূর্বোক্ত নীতিগুলো আলোচনার পর আপনারাই বলুন, এগুলো আসলে কাদের সন্তুষ্ট করবে? আল্লাহ কি এতে সন্তুষ্ট হবেন? এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কোনো একটিও কি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কিংবা অন্ততপক্ষে জায়েয? এর একটির মাধ্যমেও কি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব? সুস্পষ্ট উত্তর হলো, না। অতএব আল্লাহর পক্ষ হতে এর কোনো বৈধতা নেই।

এবার বলুন, এই নীতিগুলো কি জনগণকে সন্তুষ্ট করবে? পূর্বোক্ত যেকোনো একটি নীতির জন্যেও যদি ভোটের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কি সেগুলো যথেষ্ট জনসমর্থন পাবে? অবশ্যই না। যদি রাজনীতিবিদগণ বুঝতেন যে এগুলোকে জনগণ সমর্থন দেবে তাহলে সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্য হলেও তারা জনমতের জরিপ চালাতেন। যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট না করে থাকেন, আবার তথাকথিত জনগণের সার্বভৌমত্বও নিশ্চিত না করেন, তাহলে আপনারা আসলে কাদের সন্তুষ্ট করছেন?

আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সিনাইয়ে হামলা, গ্যাসলাইনে নিরাপত্তা, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিকে বহাল রাখা, প্যারেজের উদ্দেশে ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি—এসব কিছুর মাধ্যমে আপনারা যায়নবাদী চক্রকেই খুশি করছেন। পাঠ্যক্রমে ইঞ্জিলের বাণী, খ্রিষ্টানদের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান, অপহৃত বোনদের গির্জার হাতে অর্পণ করে আপনারা খ্রিষ্টানদেরই সন্তুষ্ট করছেন। পশ্চিমের সমর্থনপ্রাপ্ত মুজাহিদবিদ্বেষী কেনিয়া ও ইথিওপিয়ার সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে আপনারা মুনাফিকদের সন্তুষ্ট করছেন। ইরানকে সিরিয়ার যুদ্ধাপরাধ থেকে অব্যাহতি দিয়ে শিয়া ও রাফেজীদের সন্তুষ্ট করছেন। সংবিধানের ধারাগুলো মেনে নিয়ে সেক্যুলার জাহেলীদের খুশি করছেন। আপনাদের কাজকর্ম অশ্লীল ও ফাসিক অভিনয়শিল্পীদের সন্তুষ্ট করছে। বলিউডের তৈরি ফিল্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ যারা দূতাবাসে হামলা চালিয়েছিল তাদের হত্যার মাধ্যমে আপনারা পশ্চিমকে সন্তুষ্ট করেছেন। আর এতসব কিছুর মাধ্যমে সত্যিকারার্থে শয়তানকেই খুশি করেছেন। না আল্লাহকে খুশি করেছেন না নিজেদের দাবিকৃত জনগণের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেছেন।

আপনারা যদি এভাবে এই পথে স্থির থাকেন তাহলে রাসূলের ﷺ হাদীস শুনে নিন:

وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، سَخَطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عليه الناس

'যে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন, মানুষকেও তার ওপর অসন্তুষ্ট করবেন।'[১৮২]

এর আলামতও দেখা দিয়েছে। আপনাদের এতসব লাঞ্ছনাদায়ক ছাড় ও সমঝোতার পরও সেক্যুলারদের মন ভরেনি; বরং তাদের চাহিদা ও হামলা উত্তরোত্তর বাড়ছে। আমরা সংবিধানের ইসলামী ধারাটি নিয়ে এখন আর কোনো আলোচনা শুনতে পাই না। 'সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, জনগণের নয়' এমন কোনো বাক্য আমাদের কান ঘেঁষেও এখন আর যায় না। এখন তো দেখা যাচ্ছে আপনারা না আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করছেন না জনগণের সার্বভৌমত্বকে। একটু-আধটু যে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা শোনা যায়, সমাজে এটিরও কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এর কথা বলে ঠিকই কিন্তু শরীয়াহকে চাপা দেওয়া হচ্ছে; বরং এর দোহাই দিয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবিকে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে,

---

১৮২. তিরমিজি: ২৪১৪।

তোমরা শরীয়াহ চাপিয়ে দিতে পার না, জনগণ নিজের ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখে!

এমনকি শরীয়াহকে দমন করার পর আপনারা এখন এমন-সব নীতি বাস্তবায়ন করছেন, যা শরীয়াহর শত্রুদেরই কেবল মনঃপূত হবে। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি ভেঙে চুরমার করে লাভ-ক্ষতির যে হিসাব আপনারা শুরু করেছিলেন এগুলো হলো সেগুলোরই কুফল।

শেষে আমরা বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলের কর্মীদের উদ্দেশে বলতে চাই, এখন তো সব স্পষ্ট হয়েছে, ধুলো সরে গিয়েছে। ভেতরের অবস্থা এখন আপনাদের চোখের সামনে। এখনো কী সময় হয়নি সমস্ত দলান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে মহান রব্বুল আলামীনের সামনে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা করার?

আল্লাহ তো বলেছেন, কিন্তু!

'গণতন্ত্রের ইসলামীকরণ: যে ক্ষতির কোনো তুলনা হয় না' পর্বে আমরা এই রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করেছি। তার পরবর্তী পর্বে আমরা' জনগণের সার্বভৌমত্ব' পরিভাষাটির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম।

আজ আমরা কথা বলব, আরেকটি নেতিবাচক চিন্তাগত সমস্যা সম্পর্কে, যা খুব বেশি সংস্কার ও গুরুত্বের দাবি রাখে। আর তা হলো, শরীয়তের বিভিন্ন উদ্ধৃতির ওপর জনগণের মাঝে অশ্রদ্ধা তৈরি হওয়া। সামান্য যুক্তির কারণে কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের বিরোধিতা করা।

যখন আমরা কোনো আচরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পর, কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি বর্ণনা করি তখন বিরোধী-পক্ষ আমাদের আলোচনাকে শুধু যুক্তি দ্বারাই খণ্ডন করেন। কোনোরকম বিপক্ষ উদ্ধৃতি তারা পেশ করেন না। আমরা যদি তাদের বলি, আল্লাহ এমন বলেছেন, আল্লাহর রাসূল এমনটা বলেছেন। তখন তাদের জবাব হয়: "এই পদ্ধতি এখন আর সফল হবে না। সময় পাল্টেছে। তোমার কথা শুনলে তো সেক্যুলারদের জন্যে মাঠ খালি করে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। তখন

দা'ওয়াতের অবস্থা নাজুক পরিস্থিতি ধারণ করবে। ধরে ধরে মুসলিমদের কারাগারে ভরা হবে। তোমার কথানুযায়ী কাজ করলে অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা খুব সহজ। কিন্তু তুমি যা ভাবছ পরিস্থিতি তারচেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক। তোমার কথা মানলে শত্রুরা আমাদের ওপর উন্মাদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা আমাদের সমস্ত অর্জন হারাব। তখন আর আফসোস করে লাভ হবে না।"

তাদের অনেকে আবার এভাবে উত্তর দেন: বসে বসে মন্তব্য করা খুব সহজ। কিন্তু আসল ময়দানের যুদ্ধ কিন্তু অতটা সোজা না। তোমাদের কথাগুলো আসলে কিছু কাল্পনিক উদাহরণ। বাস্তবতার সামনে এগুলোর কোনো মূল্যই নেই।"

খুব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, মহান লক্ষ্যের অধিকারী, কৌশল ও প্রজ্ঞায় নুইয়ে পড়া ব্যক্তির মতো করে তারা কথাগুলো বলেন। অথচ তাদের এই বক্তব্য মূলত কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতিকে সূক্ষ্মভাবে অস্বীকার করার নামান্তর। তাদের কথা থেকে এ-ই প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়াহর মধ্যে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে, এটি সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা রাখে না। এসব বক্তব্য আগের লোকদেরও ছিল:

﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾

'তারা বলল, আমরা যদি তোমার সাথে সঠিক পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।'[১৮৩]

যখন আমরা তাদের দলিলস্বরূপ বলি, আল্লাহ এমন বলেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনটা বলেছেন, তখন আমাদের ধারণা হয় যে, যেহেতু মুসলিমদের সাথেই আমাদের এই আলোচনা তাই শরীয়াহর উদ্ধৃতি পেশ করে আমরাই শক্তিশালী অবস্থানে আছি। কিন্তু সাথে সাথেই আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি যখন দেখতে পাই এদের নিকট এই উদ্ধৃতিগুলোর খুব একটা মূল্য নেই। তখন তাদের উত্তর হয়: কিন্তু... সময়... বাস্তবতা... ইত্যাদি। অনেক সময় তারা আল্লাহ ও রাসূলের বাণীকে রদ করার সময় ভাষার তীব্রতা যাতে একটু কমে আসে তাই কিছু অস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেন। তারা জবাব দেন এভাবে, 'আল্লাহর রাসূলও তো হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় ছাড় দিয়েছিলেন', 'তুমি যেসবের কথা বলছ ইসলাম সেদিকে ডাকার কথা

---

১৮৩. সূরা কাসাস: ৫৭।

না', 'এগুলো তোমার ব্যক্তিগত বুঝ', 'তোমরা সব সময় একটি আয়াত নিয়ে বসে থাকো, আশেপাশের পরিস্থিতির দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই তোমাদের নেই'।

আচ্ছা আমরা তাদের বলি: তাহলে আমাদের ইসলামের সঠিক বুঝটি দেখান। অন্য উদ্ধৃতি আমাদের নিকট পেশ করুন। আমরা তখন নতুনভাবে বুঝব। তখন তাদের কোনো উত্তর থাকে না। কারণ, তাদের বক্তব্যগুলো মূলত হেঁয়ালিপূর্ণ ও নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী ছিল। আমরা এখানে তাদের কথাগুলোর ক্ষেত্রে 'যুক্তি' শব্দ ব্যবহার করছি মূলত সকলের বুঝতে যাতে সুবিধা হয় সে জন্যে। আর নাহয় বাস্তবে এগুলো কিন্তু মনোপ্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের এই পন্থা সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ হুকুমকে রদ করার নামান্তর। অথচ ইসলাম, আল্লাহর হুকুমের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম। নিম্নোক্ত এই আয়াতের প্রতি ভরসা, দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমান রাখা অপরিহার্য,

﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'তোমাদের নিকট হয়তো কোনো একটি বিষয় অপছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের নিকট পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না।'[১৮৪]

ইসলাম হলো, এমন কাজ করা, যা আপনার বিবেক-বুদ্ধি ও মনের চাহিদার বিপরীত। কিন্তু আপনি তা করছেন আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রহমতের ওপর ভরসা করে।

কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সংশয়ের কারণে শরীয়াহর উদ্ধৃতিকে রদ করা, তার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হওয়ার নামান্তর। শ্রদ্ধা ও সম্মান শুধু কুরআনকে চুমু খাওয়া কিংবা ঘরে ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

---

১৮৪. সূরা বাকারা: ২১৬।

'মুমিনদের যখন নিজেদের বিষয়ে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের বক্তব্য কেবল এটুকুই থাকে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম।'[১৮৫]

অতএব যারা নিজেদের মুমিন দাবি করবে তাদের উত্তরও এমনটাই হতে হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা, মহান আল্লাহ মু'মিনদের আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে অনুমতি নেওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো কাজ সম্পাদন করা থেকে নিষেধ করেছেন। বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

'মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রগামী হোয়ো না।'[১৮৬]

অথচ এখন অনেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ আসার পরও শুধু কিছু যুক্তির দোহায় দিয়ে তা রদ করছে!

নবীজির ﷺ উপস্থিতিতে উঁচু স্বরে কথা বলতে পর্যন্ত মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

'মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বোলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তোমরা টেরও পাবে না।'[১৮৭]

আবু বকর ও উমরের মতো উত্তম ব্যক্তিদের আমল ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল শুধু বনু তামীমের আমীর নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদের স্বর উঁচু হয়ে যাওয়ার কারণে। বুখারীর বর্ণনামতে, তারা আল্লাহর নবীর সাথে কথা কাটাকাটি করেননি, তাঁর আদেশকে ফিরিয়ে দেননি, শুধু তার উপস্থিতিতে সামান্য স্বর উঁচু করে ফেলেছিলেন।[১৮৮]

---

১৮৫. সূরা নুর: ৫১।

১৮৬. সূরা হুজরাত: ১।

১৮৭. সূরা হুজরাত: ২।

১৮৮. সহীহ বুখারী: ৭৩০২।

এতেই সতর্কবাণী এসেছিল:

﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

'এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তোমরা টেরও পাবে না।'

সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কী হবে আপনারাই বলুন, যাকে বলা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল এমনটা বলেছেন আর সে উত্তর দিচ্ছে: কিন্তু আমি মনে করি..., বাস্তবতা ভিন্ন..., ফলাফল...! এরা কি ভয় পায় না যে, এদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর এরা তা টেরও পাবে না।

যারা কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণকে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই জবাব দেবে তাদের ব্যাপারে আমাদের বিপত্তি নেই। যদি তারা আয়াতকে ব্যাখ্যা করে এভাবে বলে: হতে পারে এই আয়াতটি عام (অনির্ধারিত), এই ব্যাপারে অন্য একটি خاص (নির্ধারিত) আয়াত আছে। কিংবা এটি مطلق (নিঃশর্ত) আয়াত, এই ব্যাপারে আরেকটি مقيد (শর্তযুক্ত) আয়াত আছে। কিংবা এই আয়াতটি রহিত। কিংবা হাদিসটি অসত্য। কিংবা তোমরা সঠিকভাবে বোঝোনি, সঠিকটি হলো এমন। কিংবা উপযুক্ত স্থানে না করে একটির দলিল অন্য জায়গায় পেশ করেছ। যদি তারা এভাবে উত্তর দিতেন তাহলে বিষয়টি এতটা ভয়ংকর হতো না। তখন আলোচনার একটি পথ খোলা থাকত, এর মাধ্যমে ফলাফলে পৌঁছানো সম্ভব ছিল। কিন্তু তারা সরাসরি বলে বসেন: বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনীতির দাবি অনুযায়ী আমরা এখন যা করছি তা-ই সঠিক!

ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ লিখেছেন:

﴿ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ﴾

'তারা নিজেদের কাছে আগত কোনো দলিল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে।'[১৮৯]

"এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে খণ্ডন করা নাজায়েয। কারও কর্ম কিংবা আদেশের মাধ্যমেও না।

---

১৮৯. সূরা মু'মিন: ৫৬।

কোনো রাষ্ট্র কিংবা নীতির কারণেও না। কারণ, তখন নিজেদের কাছে আগত কোনো দলিল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।"[১৯০]

অতএব আল্লাহর বান্দা, সতর্ক হোন। এই তর্ক আল্লাহর ক্রোধকে টেনে আনবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

'যারা নিজেদের কাছে আগত কোনো দলিল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এই কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের নিকট খুবই ঘৃণ্য।'[১৯১]

যারাই ঈমানের সুঘ্রাণ নিয়েছেন, আল্লাহর কালামের ওপর এই ধরনের তর্ক তাদের ক্রোধান্বিত করবেই।

ইবনে রজব হাম্বলী ﷺ তার কিতাবে লিখেছেন: "শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো কাজের আদেশ কিংবা নিষেধ করা হলে তখন যদি শ্রোতার অন্তর এই আদেশ-নিষেধ না শুনে অন্য কোনো বিষয় অনুমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে, তাহলে এমনটি করা হারাম। কারণ, আল্লাহর আদেশ পালনের যে স্পৃহা আছে তা এই ধরনের অনুমানের কারণে স্তিমিত হয়ে যায়।"[১৯২]

এতকিছু সত্ত্বেও আমার ভাইয়েরা বলেন: আমরা যদি তোমাদের কথা মেনে নিই তাহলে এমন এমন ঘটতে পারে, আমরা এই এই অর্জন হারাতে পারি।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ বক্তব্য আনার পরও যারা 'কিন্তু' বলত সাহাবায়ে কেরাম তাদের তীব্রভাবে শাসাতেন। একবার হযরত ইমরান বিন হুসাইন বর্ণনা করছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

'লজ্জাশীলতার সবটুকুই কল্যাণকর।'

---

১৯০. মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম: ৭৮/১৯। মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ।

১৯১. সূরা গাফের: ৩৫।

১৯২. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম: ২৫৮/১। দারুস সালাম।

তখন বুশাইর বিন কা'ব বলে উঠলেন, আমরা কিছু কিছু গ্রন্থে দেখতে পাই যে, লজ্জা দ্বারা প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য অর্জিত হয়। সে সাথে এর মাধ্যমে দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়। এই কথা শুনে হযরত ইমরান ﷺ এতটাই রাগান্বিত হলেন যে, তার দুই চোখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি তার বিরোধিতা করছ?[১৯৩]

আরেকবার উবাদাহ বিন সামেত ﷺ বর্ণনা করছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। শুনে এক লোক বলে উঠল, আমি কোনো অসুবিধা দেখছি না। হাতে হাতে নগদই তো। তখন হযরত উবাদা বলেছিলেন: আমি তোমাকে নবীজির হাদিস শোনাচ্ছি আর তুমি বলছ কোনো অসুবিধে নেই! ওয়াল্লাহি! আমাকে আর তোমাকে ছায়ায় আশ্রয় দেওয়া হবে না।[১৯৪]

প্রিয় ভাইয়েরা, লক্ষ করুন, সাহাবায়ে কেরাম যে কথাগুলোর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন সে কথাগুলো মূলত আকস্মিকভাবেই ছিল। যারা বলেছেন তারা তওবা করবেন না এমনটা ভাবা যায় না। তারা এমন কোনো স্থায়ী পদ্ধতিও অনুসরণ করতেন না, যা বারবার শরীয়াহর উদ্ধৃতিকে রদ করে দেয়।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা আজকের পর্ব শেষ করছি। তিনি বলেন: "সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন কেউ কি ছিলেন, যারা রাসূলের বক্তব্য শোনার পর একে নিজের যুক্তি, বুদ্ধি, রুচি, অনুভূতি কিংবা নীতির মাধ্যমে বিরোধিতা করেছেন? তাদের কেউ কি কখনো রাসূলের বক্তব্যের ওপর নিজের যুক্তি, বুদ্ধি, রুচি কিংবা নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন? আল্লাহ তাআলা তাদের এসব থেকে রক্ষা করেছেন। হযরত উমর ﷺ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, যারা আল্লাহর রাসূলের কথার ওপর উমরের হুকুমকে প্রাধান্য দেবে তাদের গর্দান কাটা হবে। হায় আল্লাহ! তিনি যদি তা দেখতে পেতেন যা আমরা বর্তমানে দেখছি!? নিষ্পাপ রাসূলের ﷺ বাণীর ওপর অন্যান্য ব্যক্তির মতকে প্রাধান্য দেওয়ার এই ভয়ংকর পরিস্থিতি যদি তিনি প্রত্যক্ষ করতেন! আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওপর যারা নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেয় তাদের বড়গলা যদি তিনি শুনতে পেতেন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী। তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[১৯৫]

---

১৯৩. সহীহ বুখারী: ৬১১৭।

১৯৪. সুনান আদ দারেমি: ৪৫৭।

১৯৫. মাদারিজুস সালেকীন: ৩১০/১।

শরীয়াহ্ ব্যতীত
অন্য শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করার ভয়াবহতা

প্রিয় ভাইয়েরা, শেষ আট পর্বে আমরা মানবরচিত শাসনব্যবস্থায় ইসলামপন্থীদের অংশগ্রহণের কারণে যেসব আকীদাগত বিভ্রান্তি জনমনে প্রভাব ফেলছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই পর্বে আমরা বর্ণনা করব, আরেকটি ভয়ংকর দিক সম্পর্কে। সেটি হলো, অধিকাংশ মানুষ এখন আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহ ব্যতীত অন্য শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর ও সূক্ষ্ম। আশা করি মনোযোগ দেবেন।

আজকের এই আলোচনা আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহ ব্যতীত অন্য সংবিধানের মাধ্যমে শাসন করার হুকুম সম্পর্কে নয়; বরং এই শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করা সম্পর্কে। এই আলোচনায় আমরা, মানবরচিত আইন অনুযায়ী যারা শাসন করবে তারা কাফের কিংবা কাফের নয় সে বিষয়ে আলোচনা করব না। আসুন আমাদের ভাবনাগুলো একটু সাজিয়ে নিয়:

প্রথমত আসুন! আমরা তো অন্তত এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্যকিছুর মাধ্যমে শাসন করা গুনাহ। কুফরী হোক কিংবা নাহোক, সেদিকে লক্ষ করা ছাড়া।

আরব বসন্তের আগে, সালাফী উলামায়ে কেরাম ও শাসকপন্থী দরবারি আলেমদের মাঝে এই তর্ক চলত যে, এইভাবে শাসন করা কুফরে আকবর, যা দীন থেকে ব্যক্তিকে বের করে দেবে, কিংবা কুফরে আসগর যার কারণে ব্যক্তি দীনের গণ্ডি থেকে বের হবে না।

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

'আর যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী শাসন করে না, তারাই কাফের।'[১৯৬]

---

১৯৬. সূরা মায়েদা: ৪৪।

এই আয়াত দরবারি আলেমদের সামনে তেলাওয়াত করা হলে তারা চেষ্টা করতেন নিজেদের শাসককে 'কাফিরে'র গণ্ডি থেকে বের করে 'ফাসিক' বা 'জালিমে'র গণ্ডিতে নিয়ে আসতে। যাতে শাসকদের অন্তত 'ইসলাম' নামটা বাকি থাকতে পারে, আর জনগণের ওপর যাতে আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মুসলিম শাসকের আনুগত্য আবশ্যক করা যায়। কিন্তু তারা আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়াহকে বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করাকে বৈধ বলার ধৃষ্টতা কখনো দেখাননি। অতএব কুফরী নাকি কুফরী না সে বিষয়টি বাদ দিয়ে আমরা অন্তত এটি যে গুনাহ সেটির ওপর একমত থাকতে পারি। তারপর আমরা এই বিষয়েও একমত হতে পারি যে, এটি জরুরিয়াতে দীনের অংশ, যা অস্বীকার করা কোনো মুসলিমের জন্যই জায়েয নয়। এই ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা সুস্পষ্ট ও প্রচুর। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

'আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিচার-ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে।'[১৯৭]

অন্য আয়াতে বলেন:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'অতঃপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের ওপর। কাজেই আপনি এর অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।'[১৯৮]

তিনি আরও বলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'শাসন একমাত্র আল্লাহর।'[১৯৯]

---

১৯৭. সূরা নিসা: ৬৫।

১৯৮. সূরা জাসিয়া: ১৮।

১৯৯. প্রাগুক্ত।

অন্য জায়গায় এসেছে:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে।'[২০০]

নবীজির এই আয়াতের ব্যাখ্যা[২০১] ও মুসলিমদের ইজমার মাধ্যমে এই কথা প্রমাণিত যে, শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। পুরো উম্মাহ এই ব্যাপারে একমত যে, শরীয়াহকে সরিয়ে দিয়ে অন্যকিছুকে মূলভিত্তি নির্ধারণ করে শাসন পরিচালনা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

কিন্তু সমস্যা যেটি দাঁড়িয়েছে সেটি হলো, ইসলামপন্থীরা এই জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কারণে জনগণের নিকট একটি ভুল ম্যাসেজ পৌঁছেছে। তারা শরীয়াহ ব্যতীত অন্যান্য শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করতে শুরু করেছে, অকাট্যভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে হালাল ভাবছে।

এখন আমরা জনসাধারণের মুখে এই কথাও শুনছি যে, "জনগণ এখন শরীয়াহ গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত। এখন বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে সহযোগিতা করলেই শরীয়াহ বাস্তবায়ন সম্ভব। শরীয়াহর ওপর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। শরীয়াহ প্রয়োগের পূর্বে মানুষের অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা জরুরি।"

এ ছাড়া এমন আরও অনেক বক্তব্য, যা আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে বাদ দিয়ে বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করে।

দরবারি আলেমগণ আগে শাসক যে মুসলিম, সে পরিচয় সাব্যস্ত করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। তাদের দলিল ছিল যে, কাফের তখন হবে যখন শাসক শরীয়াহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করাকে হালাল মনে করবে—এখন যেহেতু সে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করলেও তা হালাল মনে করে না তাই সে মুসলিম। তখন সালাফী আলেমগণ তাদের উত্তরে বলতেন যে, না! এই ধরনের শাসন সুস্পষ্ট কুফরী। হালাল মনে করুক বা না করুক। অথচ এখন এই আলেমগণই খোদ নিজেরাই জনগণের সামনে একে হালাল হিসেবে উপস্থাপন করছেন! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

---

২০০. সূরা তাওবাহ: ৩১।

২০১. ১০১ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমস্যা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় যে, ইসলামপন্থীরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে শক্তিশালী নন বিধায় শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে তারা অক্ষম; বরং মূল সমস্যা হলো, আমরা জনগণকে এখন বলতে শুনি যে, ইসলামপন্থীগণ যদি শক্তিশালী হয়েও যায় তবু তারা চাইলে শরীয়াহকে মওকুফ করতে পারেন। অর্থাৎ দিনশেষে, অকাট্য ও স্পষ্ট হারাম কাজকে হালাল মনে করা হচ্ছে, এগুলোকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে। আবার তারা এ সমস্ত কথা বলছেন বুদ্ধিবৃত্তি ও হেকমতের নাম দিয়ে। তারা মনে করছেন যে, এই সময়ে শরীয়াহ প্রয়োগ করা মূলত নির্বুদ্ধিতা ও যুগের চাহিদার বিপরীত।

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা এখন মানুষদের মাঝে যা প্রচার করছেন তা মদ, ব্যভিচার ও সুদকে হালাল বলার নামান্তর। এককথায় মানুষের আকীদাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। জাহমিয়া, মুরজিয়া ও মু'তাজিলা চিন্তার চেয়েও এই চিন্তা বড় ভয়ানক।

আগে স্বৈরশাসনের সময়ে যারা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহকে বাদ দিয়ে অন্য বিধানে শাসনকার্য পরিচালনা করত তাদের দল খুব একটা ভারী ছিল না। কিছু সুবিধাবাদীই মূলত তাদের অনুসরণ করত। অন্তরেই হোক-না কেন—সকলেই তাদের অপছন্দ করত। কিন্তু এই যুগের পরিস্থিতি বড়ই ভয়াবহ। বর্তমান শ্মশ্রুমণ্ডিত জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার ফাঁদে পা দিচ্ছে অধিকাংশ জনগণ। তারা ইসলামী নাম দেখে এমনভাবে এদের দলে ভিড়েছে, তাদের এমনভাবে সমর্থন দিচ্ছে যে, আমার ভয় হয় না জানি সরাসরি জাহেলী রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরাধ এদের ঘাড়ের ওপরও বর্তে না যায়।

এই বিষয়গুলো অনেক হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

'অচিরেই এমন কতক শাসকের উদ্ভব ঘটবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো)।'[২০২]

---

২০২. তিরমিজি: ২২৬৫।

আরেক হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

'অতঃপর তাদের পরে এমন কিছু লোক আসবে, তারা যা বলে তা করে না, এবং তারা তা করে যার আদেশ তাদের দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ মুখ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। তারপর এরা ছাড়া অন্য কারও সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।'[২০৩]

এই মানবরচিত আইনের মাধ্যমে শাসন করাকে যারা সমর্থন করে তাদের সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকলে তাও চলে যাবে!

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كان كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

'কোনো স্থানে যখন অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি যদি তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে সে অনুপস্থিতদের মধ্যে গণ্য হবে (তার গুনাহ হবে না)। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে সন্তুষ্ট হবে, সে অন্যায়ে উপস্থিতদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।'[২০৪]

চার ব্যক্তির হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْمًا وَلاَ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ. فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ

---

২০৩. সহীহ মুসলিম: ৫০।
২০৪. আবু দাউদ: ৪৩৪৫।

'এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জ্ঞান ও সম্পদ কোনোটাই দান করেননি। সে বলল, আমার যদি সম্পদ থাকত তাহলে আমি তার মতো (মন্দ) কাজে ব্যবহার করতাম। আর এই দু-ব্যক্তি সমান অপরাধী।'[২০৫]

অতএব, মানবরচিত আইনকে যে সমর্থন করবে সে, আর যে সে আইন অনুযায়ী শাসন করবে তাদের উভয়ের শাস্তি একই।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই বিষয়টি খুবই গুরুতর, খেল-তামাশা করে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এই কথাগুলো শোনার পরও অনেকেই এখন অর্জনের কথা বলবেন। কোন সে অর্জন? প্রেসিডেন্ট একটি কারখানা উদ্বোধন করেছেন! চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন! চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন! যেন এই কাজগুলো মানবরচিত আইনে অংশগ্রহণের মতো গুরুতর অপরাধকে ঢেকে দেবে। যেন অর্জনের তুলনায় এই গুনাহগুলো খুবই ছোটখাটো বিষয়! কোনো তুলনাই চলে না!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷬ লিখেছেন: "অকাট্য দলিল ও সমস্ত উম্মাহর ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই কথা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে সমর্থন করবে, কিংবা মুহাম্মাদের ﷺ শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করবে সে কাফের। যেভাবে কেউ কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করলে কাফের হয়।"[২০৬]

শাইখ মাহমুদ শাকের ﷬ বলেন: ফিতনাবাজেরা এই সময়, শাসক যাতে মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে শাসন করতে পারে সে ফোঁকর খুজতে থাকেন। তারা যাবতীয় সব বিষয়ে শরীয়াহকে বাদ দিয়ে অন্য জীবনব্যবস্থার মাধ্যমে শাসন করার অপেক্ষায় থাকেন, মুসলিমদের দেশে তারা কাফেরদের আইনের প্রচলন করতে চান। এই

---

২০৫. হাদীসের পুরো অংশ: এ উম্মতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তি-সদৃশ। ১. এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। ২. এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ওই ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মতো তা কাজে লাগাতাম। এ দুজন সমান পুরস্কার লাভের অধিকারী। ৩. এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে তার মালে ভ্রষ্টনীতি গ্রহণ করে, তা অন্যায় পথে ব্যয় করে। ৪. এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান ও সম্পদ কোনোটিই দান করেননি। সে বলে, তার অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে তার মতো (ভ্রষ্ট) কাজে লাগাতাম। এই দু-ব্যক্তি সমান অপরাধী। -তিরমিজি: ২৩২৫।

২০৬. মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম: ৫২৪/২৮। মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ।

ধরনের ব্যক্তিরা যদি হযরত ইবনে আব্বাসের 'ছোট কুফর'[২০৭] বাক্যটিকে ভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করে শাসকের অনুগামী বানাতে চায়, কিংবা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার বিপরীতে শাসন করার সমর্থনে পেশ করতে চায়, কিংবা এই আইন আল্লাহর বান্দাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে শরীয়তে তার বিধান হলো সে, আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারী। তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তবু সে এই জঘন্য কাজে অটল থাকে, এভাবে আল্লাহর বিধান পাল্টাতে থাকে, অহংকার করতে থাকে তাহলে কুফরীর ওপর অটল কাফিরের বিধান তো সকলেরই জানা।"[২০৮]

এখন যে সমস্ত ভাইয়েরা আমাদের সাথে একমত পোষণ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এই সমর্থনকারীদের কাফের আখ্যা দিতে তড়িঘড়ি করতে যাবেন না; বরং মানুষের হেদায়াতের চিন্তায় নিমগ্ন হোন। কীভাবে এই আকীদাগত ভ্রান্তি থেকে তাদের মুক্ত করা যায়, কীভাবে হকের পথ তাদের নিকট স্পষ্ট করা যায়। আহলুস সুন্নাহ হক অনুযায়ী চলে ও মানুষকে রহম করে। কাফের আখ্যা দেওয়ার বিষয়টি বেশ জটিল। শর্ত পূরণ হতে হবে, বাধা দূর হতে হবে। তা ছাড়া এই পরিস্থিতিতে কোনটি ঈমান ভঙ্গকারী বক্তব্য আর কোনটি নয় তা পার্থক্য করা বেশ জটিল বিষয়। আমরা মানুষদের নিকট শুধু এই বিষয়টিরই খোলাসা করব যে, তাদের এই সমর্থন আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আশা করি, আমরা যদি হককে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে অধিকাংশ মানুষই সঠিক পথে ফিরে আসবে।

আর যারা আমাদের সাথে মতানৈক্য রাখেন তাদের উদ্দেশে আমরা বলব: হে আল্লাহর বান্দা, আত্মসম্মানের দোহাই দিয়ে নিজের পাপে স্থির হয়ে থাকবেন না। এতসব কথা আমরা আপনাকে কাফের আখ্যা দেওয়ার জন্যে শোনাইনি; বরং আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করার ক্ষতি কতটুকু তা আপনাকে উপলব্ধি করাতে চাই। এসব কথার অবতারণা আপনার প্রতি শুভকামনা থেকে। যাতে আপনি স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন। নিজের কানকে বন্ধ করে রাখবেন না, হক স্পষ্ট হওয়ার পরও অন্ধ হয়ে থাকবেন

---

২০৭. মহান আল্লাহ বলেন: যারা আল্লাহর দেওয়া হুকুম অনুযায়ী শাসন করবে না তারা কাফের। সে আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ؓ বলেন: কুফরী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোট কুফর। তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে জানতে পড়ুন তাহযীবু মাদারিজিস সালেকীন: ১৭৪।

২০৮. উমদাতুত তাফসীর: ১৫৭/৪।

না। কত মানুষ হককে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পরও শুধু নেতার ভালোবাসা কিংবা দলান্ধতার কারণে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। ফলে আল্লাহ তাদের অন্তর নিফাক দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহর ওপর প্রথমবারেই বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাদের চোখ ও কানকে তিনি অকেজো করে দিয়েছেন।

এখন একজন জনপ্রিয় ইসলামপন্থীর বক্তব্য শুনুন, বুঝতে পারবেন পর্যায়ক্রমে ভ্রান্তি একজন মানুষকে শেষমেশ কোথায় নিয়ে যেতে পারে। সে বলছে: "অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ যে খেলাফতের কথা বলছে তা কখনোই আগের মতো প্রতিষ্ঠিত হবে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এটি উপযুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি মোটেও সময়োপযোগী নয়। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাই হলো এখন মূলভিত্তি। এটি শরীয়াহকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে; বরং এখন শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা জায়েয নয় বলেই আমি মনে করি। সকলের সাথে এই বিষয়ে আমি তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার কথাটি একটি গ্রহণযোগ্য ফিকহী মতামত।"[২০৯]

এই বক্তব্যে দেখুন কীভাবে সুস্পষ্টভাবে শরীয়াহকে অস্বীকার করা হয়েছে—এমনকি হারাম পর্যন্ত ঘোষণা করা হচ্ছে! শরীয়াহকে বাদ দিয়ে মানবরচিত আইনে শাসন করা এখন গ্রহণযোগ্য ফিকহী মতামতে পরিণত হয়েছে! যেন এই বিষয়টি একটি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা, যেটির পক্ষে-বিপক্ষে বিশদ পর্যালোচনা করার সুযোগ আছে!

সারকথা হলো, মানবরচিত শাসনব্যবস্থায় ইসলামপন্থীদের অংশগ্রহণের কারণে যেসব বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে তার একটি হলো, অধিকাংশ মানুষ এখন আল্লাহর দেওয়া শরীয়াহ ব্যতীত অন্য শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছে। অথচ এই বিষয়টি হারাম বলে জানা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দিন।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

---

২০৯. হামাসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সাইয়্যেদ আবু মুসামেহ আল হায়াত পত্রিকাকে এই সাক্ষাৎকার দেন। http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=৮৪৪৭২

ড. ইয়াদ কুনাইবী সে সমস্ত বিশ্লেষকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আরব বসন্তের সময়ে ইসলামপন্থীদের আচরণ খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার এই সিরিজ তিনি শুরু করেন ২০১২ সালে। যে সময় মিসরের শাসনক্ষমতায় ছিল ইসলামপন্থী দল ইখওয়ানুল মুসলিমীন। তিনি তাদেরকে মূল উদ্দেশ্যে রেখে সংশোধনীমূলক একের পর এক বার্তা দিতে থাকেন এই সিরিজের মাধ্যমে। কিন্তু গণতন্ত্রের স্রোতে ভেসে যাওয়া উম্মাহ, দূরদর্শী চোখের এই সতর্কবার্তায় কর্ণপাত করেনি। তাই সে সময় সিরিজটি খুব একটা পরিচিতি পায়নি।

কিন্তু ১৩-তে যখন মুরসির পতন ঘটল, তারপর একে একে ইসলামপন্থীদের ভুলগুলো স্পষ্ট হতে লাগল তখন এই সিরিজটি প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। কয়েক বছর আগের ভিডিওগুলো যেন তখন জীবন্ত হতে থাকল, দিনে দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা বাড়তে লাগল। এই ঘটনা নিশ্চয় সিরিজটির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তা বুঝতে সহায়তা করবে।

মোডারেট ইসলামের দৌরাত্ম্যে প্রতারিত আজকের যুবকশ্রেণিকে বইটি ইনশাআল্লাহ সঠিক পথ দেখাবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুনতে থাকা প্রতিটি অন্তরকে প্রচলিত ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো: ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক বা না-হোক, আমরা যেন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারি, যে অবস্থায় আমাদের অন্তরে শরীয়াহর প্রতি বিন্দু পরিমাণের বিকৃত মনোভাব থাকবে না।